রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা

বিষ্ণু দে

রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ

উর্বশী ও আর্টেমিস
চোরাবালি
পূর্বলেখ
২২শে জুন
সাত ভাই চম্পা
সন্দীপের চর
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
অন্বিষ্ট
আলেখ্য
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত
একুশ বাইশ

অনুবাদ

হে বিদেশী ফুল
মাও ৎ সে-তুঙের কবিতা
এলিঅটের কবিতা

প্রবন্ধ

রুচি ও প্রগতি
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা

বিষ্ণু দে

লেখক-সমবায়-সমিতি
কলিকাতা ২৬

শ্রীমান সত্যজিৎ রায়কে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতামালা মুখ্যত এই প্রবন্ধের উৎস। তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। তাঁরা বক্তৃতাগুলি ছাপতে অনুমতিও দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর মনোযোগী সৌজন্যে আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছেন, তা আবার এখানে সানন্দে স্মরণ করি।

লেখক সমবায় সমিতির আগ্রহে, তাঁদের বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও আমি সম্মানিত, বিশেষ করে যখন তাঁদের প্রথম প্রকাশ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী। ঋণস্বীকারের নামাবলীতে প্রথমেই মনে পড়ছে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না সিংহরায়, শ্রীমান বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমান স্বদেশরঞ্জন দত্ত।

ইচ্ছার অনুপাতে লেখার ক্ষমতা সর্বদা যথেষ্ট হয় না, তার উপরে যদি লেখক শারীরিক ভাবেও অক্ষম থাকে। কিন্তু এ প্রবন্ধের সুধী পাঠকের কাছে বিনীত লেখকের প্রত্যাশা অনেক সহিষ্ণু মনের ফলপ্রসূ জিজ্ঞাসা।

আমার এক অনতিতরুণ বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু আধুনিক কালের বাংলা কবিতার নানা বিধিনিষেধে সীমাবদ্ধ একটি সংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে বেজার হয়ে বলে ওঠেন যে, আধুনিকতার ব্যাপারটা তাঁদের কাব্যময় প্রথম যৌবনেই চুকে গেছে, কাজেই সে বিষয়ে আমার মতো অক্ষম তো নয়ই, সক্ষম ব্যক্তিরও আলোচনা করবার আর কিছু নেই। তাঁর মতো আমিও এবংবিধ আলোচনার দাবিদাওয়ার মাসিক-ত্রৈমাসিক-বার্ষিক ভিড়ে, যাকে বলে, ভূরিভোজক্লান্ত, এবং একজন ভুক্তভোগীও বটে। কিন্তু বন্ধুটির সঙ্গে তত্ত্বগতভাবে বোধহয় গোটা পথের সহযাত্রী আমি নই। এবং প্রবীণতর ও ভিন্নসাহিত্যধর্মী হলেও আরেক সাহিত্যিক বন্ধু যখন সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁর ধুলিধূসর কাব্যবিতানে আধুনিক আসলে চিরকালের চিরপ্রাচীন ব্যাপার, অর্থাৎ আধুনিক ও উপাদেয় কাব্য মাত্রেই চিরকাল সমপদবাচ্য, তখন তাঁর কথা মনে হয় একদেশ-দর্শিতা। এবং তুই সাহিত্যধর্মী অর্ধসত্যই বোধহয় সাহিত্যের পক্ষে পূর্ণভ্রান্তির মতোই বিপজ্জনক।

কারণ ইতিহাসে দেখা যায় যে, সব যুগে মানুষের জীবনে ও মননবিশ্বে সংকটবোধ সমান ভাবে তীব্র হয় নি, এবং বোধহয় হবার প্রত্যাশাটাও ইচ্ছামূলক চিন্তার খেলামাত্র। আবার এও দেখা যায় যে কোনো কোনো যুগের মননলোকে সংকটসমস্যা ও সমাধানের প্রয়াস বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে, যথা বিজ্ঞানে অথবা বিশেষ কোনো শিল্পকর্মের মধ্যে দেখা গেলেও হয়তো আরেক শিল্পকর্মে বা সাহিত্যে দেখা গেল না। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ

পর্বে মানবচৈতন্যে টান পড়ে বেশি বা কম, যখন মানুষ—অন্তত তাদের সমাজের মনীষীরা বা মননব্রতীরা আত্মসচেতন বোধ করেন অখণ্ড জীবনের নানান ধারার মধ্যে, বিশ্বের বা দেশের বা গোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার ও মননের ঐক্যের মধ্যে স্বতোবিরোধিতায়, খণ্ডিত অসংলগ্ন নানাবিধ দ্বন্দ্বে। ফলে সুকুমার-বৃত্তিসম্পন্ন সংবেদ্য ব্যক্তি-স্বরূপ হয়ে যায় যন্ত্রণাদীর্ণ, বহুভঙ্গ; তখন চৈতন্যের সংহতিতে আসে অসংলগ্নতা, সমাজের ব্যক্তিমানুষ পীড়িত বোধ করে খণ্ডিত চৈতন্যে, সংবেদনের নিঃসঙ্গতায়, সমাজেরও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বা জাতিতে জাতিতে মাথা চাড়া দেয় অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচ্ছিন্নতা।

আমাদের দেশে তথাকথিত ইঙ্গ-নেসান্স বা ইংরেজি-সঞ্জাত জাতীয় জাগরণ পর্বে এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা হয়ে ওঠে ভয়াবহ। তার উলটো দিকে, ক্ষতিপূরণের দিকে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নে প্রতিবাদের স্বদেশী ঐক্যসন্ধান, ভারত আবিষ্কারের পথে পথে পরিব্রজের ভ্রাম্যমাণ চেষ্টা। এই সংকটের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মাইকেলের মতো মহাকবির ট্রাজেডি প্রতীকের মতো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। এরকম ক্রান্তিহীন সংকটাবস্থায় সৃজনধর্মী বা ইতিমূলক কর্মিষ্ঠ প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিস্বরূপ স্বভাবতই তীব্র হয়ে ওঠে উৎক্রমণের প্রকাশপথের মুক্তি চেয়ে, তীক্ষ্ণ আততিতে আত্মভুক সর্পিল সচেতনতা নির্গত হতে চায় প্রকাশের বহির্‌রূপায়ণের মুক্তিতে। তাই এরকম তীব্রচেতন মানুষের বিকাশ চলে সত্তার সমগ্রতার হরধনুর মতো জ্যাবদ্ধ আপন বেগে।

আমাদের দুর্ভাগা দেশের আত্মঅপমানকর বহু বঞ্চনার মধ্যেও সৌভাগ্যবশত এই পর্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার স্বর্গমর্ত্যপাতালে অভিযান করে গেছেন অন্তত কয়েকজন মহীয়ান পুরুষ। রাজনীতির চারিত্রিক ক্ষেত্রে যেমন গান্ধীজী, সংস্কৃতির ব্যক্তিক ও সামাজিক

সর্বক্ষেত্রে তেমনি রবীন্দ্রনাথ। সময়ে সময়ে দেখা যায় একই মনীষা স্বষ্টিময় সংলগ্নতা পায় একাধিক শিল্পকর্মে—কাব্যে নাটকে গানে গদ্যে এমন কি নৃত্যনাট্যে—যা রবীন্দ্রনাথে দেখি অতিকায়ভাবে, যেমন কিছুটা দেখা যায় কক্‌তোর মধ্যে; অথবা যা বিস্মিত করে দেয় ব্রেখটের বহুশিল্পকর্মিষ্ঠতার উদাহরণে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্পসাহিত্যে তো বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি, মানসজীবন ও কর্মের আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত। তাঁর মতো আত্মপরিচয় লাভের আকুতি অথবা সত্তাসংকটের তীব্রতা ও ব্যাপ্তিবৈচিত্র্য বোধহয় বিশ্বে তুলনারহিত, —শিল্পপ্রতিভার মাত্রা, ঐতিহাসিক কার্যকারণ, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বিরাট সামগ্রিকতা ও তার তাত্ত্বিক সার্থকতা—সব কটি কারণে। দেশের সীমায় নিবদ্ধ থেকে তাই একটু আশ্চর্য লাগতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের সমবয়সীরা অথবা তাঁর পরবর্তীরা যাঁরা মনের ও লেখার ধরন-ধারনে নিঃসন্দেহে রাবীন্দ্রিক, তবুও এই আত্মসচেতনতার সমস্যায় তাঁর পূর্ববর্তী মাইকেলকে, এবং প্রায় যেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের মানসিক ঘর সংসারের শান্তি এবং সাহিত্যিক গয়ংগচ্ছ সরল সচ্ছলতা,—যেন বা নিজের মুখোমুখি হবার, নিজের তত্ত্বার্জিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে দীর্ণ হবার মহান দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যই তাঁদের জীবনে ও মননে ঘটে নি।

তাই কারো কারো বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে মনে হয় রবীন্দ্র-পূর্ব প্রাগৈতিহাসিক, কারো বা মনে হয় রবীন্দ্রমানসের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাই প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী-কৃষ্ণনাগরিক বিদগ্ধ প্রাখর্যে আমরা মুগ্ধ হলেও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পরিণতি কারো কারো মতে স্থিতাবস্থ। অথচ এঁরা শক্তিমত্তায় নিশ্চয়ই ভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু যাকে বলে সংযুক্ত বা জড়িত, সেই 'অঁগাজে' তাঁদের হতে হয় নি নিজের সমগ্র সত্তার সঙ্গে বাস্তব বিশ্বের যোগাযোগের সক্রিয়

সন্ধানে। তাই তাঁদের কাব্য বহন করে না কবির আত্মপরিচয়ের তাৎপর্য। বরঞ্চ পরে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের নবীনতর উত্তরাধিকারীরা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ অথবা অমিয় চক্রবর্তী কী একাগ্র ধৈর্যে একনিষ্ঠ সাধনায় রাবীন্দ্রিক জগতের বাসিন্দার স্বাভাবিক কাব্যোৎসরণে ধীরে ধীরে অর্জন করলেন আত্মসচেতন মনের কাব্যিক স্বাক্ষর। আবার, জীবনের বাস্তবতার ধাক্কা-তেও কোনো কোনো উত্তরসাধক নতুন ভাবলোকের সন্ধান দিলেন কাব্যের আবেগে, যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যেমন নজরুল ইসলাম অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্র। অথবা বন্দী কৈশোরের প্রতিবাদে বুদ্ধদেব বসু।

এবং শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতা এই মনেরই সজ্ঞানতার স্বয়ং-নির্দিষ্ট সক্রিয় বিন্যাস, কারণ এই মন চায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পরে ভাষার বহমান রূপ, তার নিজেরই প্রতিধ্বনি, মার্কিন কবি ওআলেস্ স্টীভনস্ যাকে বলেছিলেন—মনেরই কবিতা, মন যখন যা যথেষ্ট, তাই খুঁজে পায়। তন্নিবিষ্ট-মনের এই কবিতার বিষয়কে বা কাব্যিক অভিজ্ঞতাটুকুকেই—আর এই অভিজ্ঞতাটা কমবেশি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সংলগ্ন বা আত্মজীবনীমূলক হতেও পারে বা মোটেই তা নাও হতে পারে—ওই অভিজ্ঞতাটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে লেখারই মধ্যে কবিতাটির আত্মদান বা আত্মপ্রকাশ, অর্থাৎ আধার ভিন্ন আধেয় অস্তিত্বহীন। বলাই বাহুল্য এর পিছনে থাকছে কবিমানুষটির সমগ্র সত্তা অথবা সমস্ত রকমের অভিজ্ঞতার গোটা পট তাঁর স্মৃতি ও ভবিষ্যৎভাবনায় প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য, থাকছে তাঁর সমস্ত বিশ্বের পশ্চাদ্‌ভূমির, সমস্ত তত্ত্বজগতের জলহাওয়া। কিন্তু পিছনেই, কম বা বেশি; কারণ আধুনিক কাব্যের ঝোঁকটা হচ্ছে কবিতালিখনের প্রক্রিয়াতেই মননের নির্দিষ্ট কর্মিষ্ঠতার বিনীত সততায়। স্টীভন্‌সের পূর্বোক্ত কবিতাটিতে এই ব্যাপারটাতেই যে কবিত্বের প্রক্রিয়া নিহিত, তারই প্রকাশ:

মনেরই কবিতা, মন যখন যা যথেষ্ট তাই খুঁজে পায়।
সর্বদা এমনিতর ক্রিয়ায় তদ্‌গত খুঁজতে হত না
তাকে : মঞ্চ সেকালে সাজানোই থাকত, মন শুধু
পুনরাবৃত্তিতে প'ড়ে যেত লিপিতে যা লেখা।
তারপরে থিয়েটার
পালটিয়ে আরেক ব্যাপার হল : অতীত রইল স্মৃতিচিহ্ন শুধু।
আজ তাকে জীবন্ত হতেই হবে, স্থানীয় বাচন শিখে।
সমকালীন লোকের মুখোমুখি, চিনে জেনে
একালের মেয়েদেরও ; যুদ্ধ তাকে নিয়ত ভাবায়,
আর তাকে খুঁজে খুঁজে যেতে হয় যা যথেষ্ট তাই পেতে।
তাকে এখন গড়তে হয় নবনাট্যমঞ্চ। আর সেই
মঞ্চে তাকে উঠে চিরতৃপ্তিহীন এক নটের মতন
ধীর স্থির ধ্যানময় কথা ব'লে যেতে হয়, যে কথাটি
কানে কানে, মনের পেলবতম কানে তোলে প্রতিধ্বনি
ঠিক তারই যা সে শ্রবণে উৎসুক, যার
শব্দমাত্র শুনে শ্রোতৃসভা কান পাতে,
নাটকে না, নিজেদেরই মনে, প্রকাশিত হয়েছে যা
একটি আবেগে, যেন দুটি মানুষের, যেন দুটি
আবেগের একাত্ম হওয়ায়। এই অভিনেতা যেন এক
তত্ত্বজ্ঞানী মগ্ন অন্ধকারে, তোলেন ঝংকার
কোনো যন্ত্রে, কঠিন তন্ত্রীতে ঝনঝনায় যাতে ফোটে
নানান আওয়াজ আকস্মিক বহু খাঁটি সুরের লহরে,
সর্বৈব রকমে মনটা আধৃত রেখে যার নিচে নামতে
সে চায় না, যার পরে ওঠার সংকল্প তার নেই।
তাকে যে পেতেই হবে
একটি পরম তৃপ্তি খুঁজে ; বিষয়টা হতে পারে
বরফে একটি লোক চক্রিপায়ে ছোটে, এই মাত্র ;

হয়তো একটি মেয়ে নাচছে, হয়তো বা কোনো মেয়ে
বেণী বাঁধে, এইমাত্র। মনেরই ক্রিয়ার কবিতা।

—The poem of the mind in the act of finding
What will suffice. It has not always had
To find : The scene was set ; it repeated what
Was in the script.
Then the theatre was changed
To something else. Its past was a souvenir.

লক্ষ্য করবার বিষয়, স্টীভন্‌সের কবিতায় বিশেষজ্ঞ সক্রিয়তা এত প্রবল, অথচ তাঁর কাব্যের জগৎ এতই সন্ত্রস্তভাবে নির্দিষ্ট যে মনে হতে পারে এই সংকবিটি মননের নিরাপদ বিলাসিতাতে নিজেকে নিঃশেষ করে দেন, বিচ্ছিন্নতাই যেন তাঁর লক্ষ্য। মনন তাঁর প্রকৃত, স্পষ্টতই সদাজাগ্রত এবং বিশ্বের দ্বন্দ্ব বিষয়ে তাঁর সংবেদনও তাঁর কাব্যে প্রমাণিত। প্রাবন্ধিক ব্যাখ্যায় তিনিও মানুষকে, সমাজ-জীবনকে দ্বিধাদীর্ণ দেখেন : একদিকে কবি-শিল্পী আর অন্যদিকে টেকনিশ্যনস্ ও বিউরোক্রাটস্। কিন্তু তাঁর শৌখীন সমাজের তত্ত্বে এ বিরোধের সমাধান নেই; যেন একমাত্র উপায় হচ্ছে যে কবি হবে শৌখীনতর সূক্ষ্মতর কবি আর অন্যেরা থাকবে অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ, অবজ্ঞেয় মানুষ। স্টীভন্‌স নিজে ছিলেন শৌখীনতম কবি ও শিল্পের সমঝদার, আবার নাকি বিরাট ইনসিওরেন্স প্রতিষ্ঠানের মেজোকর্তা। এর পাল্‌টা উদাহরণ মেলে পশ্চিমা আরেক দেশের কবির মধ্যে, তাঁর আধুনিকতায় একালের জ্ঞানবিজ্ঞান-সংগত অর্থাৎ জীবন্ময় তত্ত্ব ও বাস্তব জগতের এবং শিল্পকর্মের ও সংবেদনের জাতিবিরোধ বা শ্রেণীবিরোধ রূপান্তরিত হয় সমাধাসম্ভব স্তরে, এক চলিষ্ণু প্রগতিশীল নিয়ন্ত্রণে। বের্তোলদ্ ব্রেশ্‌টের বা বের্টোলট ব্রেখটের কবিতাতে, নাটকে, গানে, উপন্যাসে

শিল্পসাহিত্যের মূলতত্ত্ব একই কথা বলে কিন্তু তাঁর রচনায় বিষঙ্গে বিভক্ত ব্যক্তিস্বরূপের উপলব্ধির ও রূপদানের দক্ষতায়, অখণ্ড মানবিক ব্যক্তির তীব্র বোধে জারিত তাঁর শিল্পসাফল্য এবং সে বিষয়ে তাঁর নানা ফলপ্রসূ ব্যাখ্যায়, যথা এপিক নাট্যকাব্য আলোচনায় স্টীভন্স-জাতীয় করুণ অসম্পূর্ণতা, স্ববিরোধিতা হয়ে ওঠে অনন্ত সম্ভাবনাময়, উত্তরণশীল।

এ বিচারণায় বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববিশ্ব ও শিল্প-সাহিত্যকর্মে যেমন বড় রকমের একটা মিল, তেম্‌নি একটা অনিবার্য বিরোধও উহ্য, যদিও থেকে থেকে কম বা বেশি দেখা যায় তাঁর কবিত্বে এবং প্রায়শই তাঁর চিত্রপ্রেরণায় আর প্রবীণ বয়সের স্বাধীন বা স্বাভিভাবকবহু গানে ও গীতিনাট্যে তত্ত্ব যায় হেরে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে এই তত্ত্বসংগঠন না করলে রবীন্দ্রকীর্তি থাকত অনেকাংশে মূক, অপ্রকাশিত। অবশ্য এই সমালোচনার স্বাধীনতাও আসছে রবীন্দ্রনাথের রাসায়নিক মধ্যস্থতায় ভারতের বাইরে থেকে বিশ্ব-পথিক ইওরোপের মনীষার বিশ্বজনীন বিচারণার উৎসাহে।

১৩৩৬ সালে "সাহিত্যের পথে" রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

"বর্তমান যুগে ইওরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় ইওরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। ইওরোপ যে কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, ইওরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেবকাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে ইওরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। তাই বলি সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা

বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।"

ইওরোপেই শিল্পসাহিত্যের প্রাণময়তা এবং আধুনিকতার সমস্যা সবচেয়ে ব্যাপ্ত ও তীব্র এবং সেখানে শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা হয়তো নিছক সাময়িক অর্থে আনকোরা আধুনিক নয়ঃ অর্থাৎ ভারিক্কিভাবে বলা যায়, সাংবাদিক অর্থে সাম্প্রতিক নয়! যে মননের আততিতে, চৈতন্যের যে সংকটযন্ত্রণায় মূর্ত হয় রচনায়, সৃষ্টিমূলক নির্মাণে মানুষের সত্তার বা চেতনার স্বকীয় বিক্ষুব্ধ মর্ষণময় বা উল্লাসকর প্রকাশ, সে জাতের সংকট মূলত আজকের বা কালকের নিশ্চয়ই নয়,—যদিচ অনতিতরুণ বন্ধুব্যক্তিদের ভাবতে দেখেছি যেন তাঁদের প্রথম যৌবনের বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতাও মরেছে। আবার তরুণ ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে শুনি এমন ভাবভঙ্গী করেন যেন মনের আধুনিকতা নামক অস্পষ্ট বস্তুটি জন্মলাভ করেছে ইহলোকে তাঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে।

আধুনিকতার আততির ব্যাপারটা হয়তো মনোবিজ্ঞানের পরিণতির ফলে সর্বসাধারণের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে এখন বোঝা সহজ। ফ্রয়েডোত্তর বিজ্ঞানীদের প্রামাণ্য কাজকর্মের পরে আজ এ উপলব্ধিটুকু চালু হয়ে গেছে যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও—অর্থাৎ সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে সংকটযন্ত্রণা ও উত্তরণের পর্বপরম্পরা ব্যক্তিবিশেষের সীমায়িত সমস্যা মাত্র, বড় জোর তার আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের দুশ্চিন্তা বা আনন্দের বিষয় মাত্র, সেখানেও ব্যক্তি-সত্তার সার্থকতা, স্বাস্থ্য বা উৎকর্ষ নির্ভর করে কি ভাবে ঐ সংকট-পর্বগুলি মানুষটি ব্যক্তির অহংসর্বস্বতায় নয়, বরঞ্চ অন্যসংলগ্নতায় অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসের অর্থে অতিক্রম করে। এবং এই সংকট ও উত্তরণপর্বপরম্পরার পুরুষার্থ স্পষ্ট হয়, যখন মানুষটির সত্তাসমস্যা নিছক ব্যক্তিকভাবে অস্বাস্থ্য ও স্বস্তিলাভ, বন্ধন ও উন্মো-

চনের ব্যাপার থেকে যায় না, যখন আধিব্যাধি উপছিয়ে লোকটির চরিত্র হয়ে ওঠে রূপকের মতো ব্যাপ্ত অর্থাৎ সামাজিক, ঐতিহাসিক অর্থেই অর্থবহ, মূল্যবান। মানবমন ও মানবেতিহাস অঙ্গাঙ্গী দ্বন্দ্বময়তায় জঙ্গম ঐক্যে অন্যোন্য।

তাই এরিক এরিকসনের মতো আধিবিশারদ মনীষী মনোবিজ্ঞানের গভীর দৃষ্টিতে ইতিহাস দেখেন মার্টিন লুথারের জীবন-পরীক্ষায়। এবং জর্মানির, আর অনেকাংশে পশ্চিম ইওরোপের ইতিহাসের রেনেসন্স বা আধুনিক আত্মসচেতনতার অধ্যায়গুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এই দ্বৈতযাত্রার সমদৃষ্টিতে। তরুণ মার্টিন লুথার যে অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ সে কথা আমরা সবাই জানি। শুধুমাত্র রাগী যুবক ব্যক্তি নন, নবীন মহান ব্যক্তি, a young great man, তাই তাঁর সত্তার অহম্-সংকট ব্যক্তিগত তাৎপর্যে নিঃশেষ নয়, ঐতিহাসিক পুরুষার্থে এ ঘটনাটির গরিমা।

লুথার প্রসঙ্গে সংকটতত্ত্ব আলোচনায় মানুষের প্রথম ক্রাইসিস্ বা ক্রান্তিসংকটকে এরিকসন বলেন আইডেনটিটি ক্রাইসিস্ বা আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠাসংকট এবং এর সময় হচ্ছে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধি—কারো ক্ষেত্রে ত্বরিত, কখনো বা বিলম্বিত। কোনো কোনো তরুণের ক্ষেত্রে, বিশেষ কোনো কোনো সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগে দেখা যায় আত্মসত্তার সংকট ঘটে খুবই কম মাত্রায়; আবার অন্য শ্রেণীর অন্য যুগের মানুষের ক্ষেত্রে সংকটবেদনা স্পষ্টতই হয়ে ওঠে চূড়ান্ত রকমের এক ক্রান্তিপর্ব, প্রায় এক দ্বিতীয় জন্মের মতো, এবং প্রায়শই এরকম যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে ওঠে বহুব্যাপ্ত স্নায়ুবিকারগ্রস্ত নানাবিধ আধির জন্য অথবা বিপথবিকৃত আইডিওলজিকাল বা তত্ত্বগত অস্থিরতায়। কোনো কোনো নবীন ব্যক্তি হয়তো এই সংকটের পায়ে হার মেনে ফেলে নানারকম স্নায়ুবিকার বা মনোবিকারগ্রস্ত বা অপরাধপ্রবণ আচরণে,

আবার কেউ কেউ দেখা যায় সংকটসমস্যার একটা নিরাকরণ করতে পারেন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক, নিসর্গপ্রকৃতি বা শিল্পজগতের তত্ত্বগত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

মনোবিজ্ঞানও, দেখা যাচ্ছে, এখন ইতিহাসে ও ঐতিহাসিকতায় নির্ভরশীল হয়ে উঠছে অর্থাৎ ব্যক্তিমন ও সমাজসংলগ্নতা পেয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার দিকে যাচ্ছে, যেমন যাচ্ছে কেনেথ বর্ক, ফ্রান্সিস্ ফার্গসন প্রমুখ সমালোচকদের সাহিত্য সমালোচনায়। অপরপক্ষে আশা হয় যে বাস্তবভিত্তিক ইতিহাসতত্ত্ব এবারে আর মানুষের মনকে বাতিল করে চলবে না। এরিকসন তাই কলিংউডের কথার পুনরুক্তি করেন; সে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মনীষী বলেন: ইতিহাস হচ্ছে সাক্ষাৎ মনেরই জীবন, যে মন আবার মানবমনপদ-বাচ্যই হতে পারে না, যদি না সে একই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকে এবং জানে যে ওইভাবেই তার বাঁচা সম্ভব, তা সত্যটা সে মানুক বা নাই মানুক। তাই এখন বাল্য, কৈশোর ও পূর্ণবয়স্কতার মধ্যবর্তী ত্রিশঙ্কু কালে ঐতিহ্যের নানা শক্তিসম্পদ কিভাবে অন্তরস্থ সম্পদে মিলে মানসের নবদিগন্ত, নতুন মানুষের দ্বিজত্ব, নতুন দল, নতুন যুগ সংগঠন করে, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরাও সজাগ, সচেষ্ট। যার ফলে বৈষ্ণব উক্তি: 'বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ'। এবং অক্ষয় দত্তের সেই তত্ত্ববোধিনী কথা যাতে বিপিন পাল মহাশয় চিন্তিত হয়েছিলেন; 'যৌবন বড় বিষম কাল'—দুটিই যাথার্থ্য পায়।

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে মার্টিন লুথারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা উপমামাত্র, যেমন ভিন্ন উপমায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা কেউ শেলির সঙ্গে, কেউবা দান্তে বা গয়টে বা হ্যুগোর তুল্য বলে থাকি; যেমন ডার্মস্টাটের কেইসেরলিং বলেছিলেন, গ্রীসে হোমর যা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তাই। লুথার মানুষটি নিজে এবং তাঁর দেশ ও কাল সম্পূর্ণ ভিন্ন, রবীন্দ্রনাথের এই ইংরেজশাসিত এবং

শোষিত স্বদেশ থেকে এবং তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও কর্মময় আর রচনাশীল জীবন থেকে। আমাদের তুল্য শুধু জর্মানিতে, পশ্চিম ইওরোপে মৌলিক রেনেসান্স ও মৌলিক রিফর্মেশন, পুনর্জাগরণ ও পুনর্বিধান। আর মিল শুধু এই যে লুথার জর্মান জাতির মুখে আর মনে আত্মপরিচয়ের ও আত্মপ্রকাশের ভাষা দিলেন। এই ভাষার রেনেসান্স—ভর্বাল রেনেসান্স—রবীন্দ্রনাথ দিলেন আমাদের গৌণতায় আচ্ছন্নপ্রায় মূকপ্রায় বধির হৃদয়কে, মননকে, জীবনকে।

(২)

লুথারকে ধর্মীয়তা যেমন গভীরভাবে সারাজীবন বিচলিত করেছিল, তেমনি করেছিল মধ্যযুগের রোমক সাম্রাজ্যের রাজনীতি। তার প্রতিবাদে লুথারের পিতৃবিরোধী ও পিতৃগত মুক্তিসাধনা পেল ধর্মীয় তীব্রতা ও পরমার্থ আর তাঁর মহাসম্বল ছিল সংগীত, একক ও যৌথ। মূক জর্মান মুখে যে শুধু লুথারীয় বাইবল আর তাঁর প্রচুর যাজকভাষণ ও পত্রাবলী ভাষা দিল তা নয়, পশ্চিমা গান যাঁরা শোনেন তাঁরা জানেন লুথারের রচিত আর বাখের সুরে চলমান বিখ্যাত জয়গান ঃ 'আইন ফেস্‌তে বুর্গ।'

অবশ্যই লুথার বা আর কোনো পশ্চিমা মহাপুরুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মাছিমারা তুলনা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। কিন্তু আত্মপরিচয় বা সত্তাসংক্রান্ত সংকটানুভব ও উত্তরণ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়স থেকেই আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা জাগায়। এবং মনোবিজ্ঞানে যে তিনটি ক্রান্তি বা সংকটপর্ব এই স্বীয় সত্তাবোধের আদিসংকটের পরবর্তী বলা হয় ঃ নৈঃসঙ্গ্য ও অন্তরঙ্গতার দ্বৈতাদ্বৈত সমস্যা, সৃজনশীলতার সংকট এবং স্বভাবকৈবল্যের সমস্যা—এই তিনটি মূল পর্বেই রবীন্দ্রনাথের বারংবার পরীক্ষোত্তরণ বোধহয় পৃথিবীর ব্যক্তি-ইতিহাসে এক দুর্লভ ব্যাপার। বলা বাহুল্য, যেমন বাস্তব

ইতিহাসে, কর্মময় জগতে সপ্তকাণ্ড উত্তরণ সর্বদাই সাপেক্ষ, অসম্পূর্ণ অর্থাৎ পূর্বাপরে সংলগ্ন, ব্যক্তির বিকাশেও সেই ডায়ালেকটিকস্।

'শৈশব ও সমাজ' নামক চিন্তাগভীর গ্রন্থে জর্মান-আমেরিকান ঐ বিজ্ঞানী বলেছিলেন: একমাত্র সেই ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে এই সপ্তপর্বের ফল ফলাতে পারে যে ব্যক্তি কোনো না কোনো ভাবে অবহিত থেকেছে মানুষের আর নানা বস্তুর বিষয়ে এবং নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সেই সব জয়পরাজয়ের সঙ্গে, যা বাধ্যতই জড়িয়ে পড়ে যদি ব্যক্তিটিকে হতে হয় অন্যদের জনয়িতা এবং নানা জিনিসের ও ভাবনাচিন্তার স্রষ্টা। ইগো-ইনটিগ্রিটি—আত্মসত্তার অবৈকল্য—এই নামের চেয়ে জুতসই নাম আমার জানা নেই। পরিচ্ছন্ন কোনো সংজ্ঞার অভাবে এই মানসিকতার কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ মাত্র আমি করতে পারি। এই প্রকার মনস্বিতা হচ্ছে নিয়মশৃঙ্খলা ও নিয়মশৃঙ্খলা হচ্ছে অর্থময়তার জন্য নিজের প্রবণতা বিষয়ে আত্মসত্তারই উপচিত আস্থা। এ হচ্ছে মানবসত্তার—ব্যক্তি-অহমের নয়—স্বকামোত্তীর্ণ একটা প্রেমময়তা, একরকমের অভিজ্ঞতা, যাতে সমুত্থিত হয় একটা বিশ্বশৃঙ্খলা ও একটা অধ্যাত্মবোধের অর্থময়তা—তা সে যতই দাম দিয়ে অর্জিত হোক না কেন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটি মানুষ পরিগ্রহণ করছে তার একমাত্র জীবনবৃত্তটিকে আবশ্যিক ও অনন্য অদ্বিতীয়ভাবে, যার ফলে ব্যক্তিটির স্বীয় মাতাপিতার প্রতি ভালবাসা পায় এক নতুন, স্বতন্ত্র মর্যাদা। এ মনস্বিতায় থাকে একটা মৈত্রীবন্ধন সুদূর কালের সঙ্গে ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণরীতির সঙ্গে, ওইসব কালের আর ওইসব কর্মচর্চার সরল বাণীর সঙ্গে, রচনাবস্তুর সঙ্গে। অবৈকল্যের অধিকারী জানে বটে, মানবের প্রয়াসে সাধনায় পুরুষার্থ দিয়েছে যেসব বিভিন্ন জীবনবৃত্তের রীতিসমূহ, সেগুলি সবই আপেক্ষিক। তৎসত্ত্বেও সে তার নিজের জীবনরীতির মর্যাদা রক্ষা করতে সর্বদাই

প্রস্তুত সর্বপ্রকার শারীরিক ও অর্থনৈতিক হুমকির বিরুদ্ধে। কারণ সে বোঝে যে একটি বিশেষ ব্যক্তিজীবন হল একটি জীবনবৃত্তের সঙ্গে ইতিহাসের বিশিষ্ট এক অংশের এক দৈব যোগাযোগ; এবং তার নিজের কাছে সমগ্র মানবিক অবৈকল্যাই বাঁচে বা মরে তাঁরই নির্দিষ্ট অবৈকল্যমার্গের বাঁচন-মরণে। এইভাবেই তার সংস্কৃতিতে বা তার সভ্যতায় যে অবৈকল্যরীতি বিকশিত হয়েছে, সেইটিই হয়ে ওঠে তার 'আত্মার পিতৃদায়' এবং তার নিজেরও নৈতিক পিতৃত্বের স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান। এই চরম সমাধানের সামনে মৃত্যুও হয়ে পড়ে দংষ্ট্রাবিহীন।

এরিকসনের কিশোর-প্রসঙ্গে আলোচনায় রয়েছে a young great man আর a great young man-এর তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তরুণ মহীয়ান ব্যক্তি আর মহীয়ান তরুণ ব্যক্তি দুইই প্রায় অভিন্ন মনে হয় বিস্ময়করভাবে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গেই এরিকসনের প্রশ্নটি যথার্থ তীক্ষ্ণতা পায়ঃ কিন্তু কি উপায়ে মহীয়ান ব্যক্তিটিকে আমরা চিনতে পারব বস্তুতই তিনি নিজে যা ছিলেন ঠিক সেইভাবে? ওই বিশেষণটির মধ্যেই তো ইঙ্গিত রয়েছে যে এরকম মানুষের স্বরূপে কিছু একটা আছে যা অত্যন্ত বৃহৎ, বড় বেশি ভয়সম্ভ্রমাস্পদ, বড় উজ্জ্বল—যার জন্য তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না। তবু যদি এরকম ক্ষেত্রে গোটা মানুষটিকে বর্ণিত করতে হয়, তাহলে তিনটি মাত্র পথ বাছা সম্ভব। হয় এতদূরে পিছিয়ে গিয়ে দেখতে হয় যে মহাপুরুষের চরিত্রের রূপরেখা বা পরিণাহ মনে হয় সম্পূর্ণ কিন্তু অস্পষ্ট; না হ'লে উত্তরোত্তর কাছে এগিয়ে আসতে হয় এবং তখন মনোনিবেশ করা যায় মহাজীবনের কয়েকটি মাত্র দিকে। তাতে ছোট একটি অংশও দেখায় সমগ্রের মতো বড় অথবা সমগ্র রূপটি দেখায় একটি ভগ্নাংশের মতো ছোট। দুই পদ্ধতির কোনোটিই যখন

কার্যকর না হয়, তখন শুরু হয় তর্কযুদ্ধ; এবং কেউ হয়তো মহীয়ান ব্যক্তিটিকে নিজের মালিকানায় আত্মসাৎ করতে চান এবং বাদ দিতে চান অন্যদের স্বত্বাধিকার, যাঁরা আবার নিজেদের স্বত্বের দাবি তোলেন; তাই দেখা যায়, একজন মানুষের ঐতিহাসিক প্রতিমূর্তির চেহারা প্রায়ই নির্ভর করে কোন্ পুরাণটি, কোন্ লেজেণ্ড বা কাহিনীটি সাময়িকভাবে বাকিগুলিকে দাবিয়ে জিতে যায়। তবে, ঐতিহাসিক ঘটনাটির মেজাজটা বুঝতে গেলে মহাপুরুষকে নিরীক্ষণের এই সব কটি উপায়ই প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই সীমাবদ্ধচক্ষু-দের হস্তী-দর্শন সমস্যা আমাদের কাছে এখনও খুবই প্রখর। বিড়ম্বিত দেশে পূজাপার্বণে পালায় উৎসবে মানুষের মন দৈনন্দিন জাড্য থেকে মুক্তিবোধ করে, তাই অনেকে ভেবেছিলেন যে অন্তত শতবার্ষিকীর উৎসাহে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ব্যাপক সার্থকতায় ফলবে। কিন্তু শতবার্ষিকীর বারোয়ারিও বোধ হয় সার্থক হয় নি। আপনাদের অসীম ধৈর্যের ভরসায় তিন বছর আগের বিলাপের পুনর্বিস্তার করছি।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময়ে আমাদের কারো কারো মনে বারবার স্ফুলিঙ্গের পঙক্তি কটি মনে পড়ছিল:

বড়ই সহজ
        রবিরে ব্যঙ্গ করা।
আপন আলোকে
        আপনি দিয়েছে ধরা॥

রবীন্দ্রনাথ নিজে আপন আলোকের বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের কলমে যে ভয় বারবার প্রকাশ পেয়েছিল, সে ভয়টা সেই মহাজন্মের চিরনূতন শুভক্ষণের শতবর্ষ পরেও বাস্তব থেকে গেল।... দেখা গেল যে 'কবিকাহিনী' ও 'ইওরোপ-প্রবাসীর পত্র' থেকে 'শেষ লেখা' ও 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রশ্নময়

বিকাশের আবেগদীর্ণ ইতিহাস থেকে আমাদের পাঠগ্রহণ থেকে গেছে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার আমাদের আজও সার্থকভাবে অর্জিত হল না। বিদ্যার বুদ্ধির সুরুচির চর্চা বাংলার মর্মে মর্মে আজও তাই সত্য হয়ে ওঠে নি। সংক্ষেপের পথে মৌখিক একটা ব্রাত্যস্তোমে তা হবেও না। কারণ গ্লানির উৎস বেশ গভীর, না হলে দিবাদ্বিপ্রহরে শরৎসঞ্চারী মেঘের খেলায় সূর্যকে কেন কারো মনে হবে ফরাসী উপগ্রহের চাঁদ? অথবা কারো ইচ্ছা হয়, সম্পূর্ণ অবাস্তবভাবে ব্যক্তিগত দুঃখের মধ্যে কল্পিত গ্লানির ইঙ্গিত টেনে অনধিকারচর্চার ?...

সম্প্রতি অবশ্য কয়েকটি বই এবং কিছু প্রবন্ধ পাওয়া গেছে, যাতে আমাদের সাহিত্যপ্রীতি ও বিচারবুদ্ধি যে একেবারে মৃত নয়, তা প্রমাণিত। তবে এরই মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে নানারকম প্রভাব বা অকৃতজ্ঞ ঋণগ্রহণের সন্ধান করবার একটা আতিশয্যও দ্রষ্টব্য।

অথচ এই শ্রেণীর কবিপ্রতিভার বিচার তার সামান্যতম সার্থকতা পায় তার সমগ্র, প্রায় অতিমানবিক ব্যাপ্তি ও তীব্রতার কথা সর্বদা স্মরণে রাখলে। এক পক্ষে এই ব্যাপ্তি ও গভীরতা বস্তুত সমস্ত দেশের জীবনে জাতির মননে কর্মে সঞ্চারিত হয়েছে বহু বছর ধরে। অন্যপক্ষে এই ব্যক্তিস্বরূপ ও তাঁর বহুবিধ কর্ম আর তাঁর হাজার রকমের রচনাবলী এখনও দেখি আমাদের ক্ষীণপ্রাণ দূষিত বুদ্ধিতে পূর্ণ মর্যাদা পায় কদাচিৎ। স্থূলভাবে বলতে ইচ্ছা হয় যে আমরা প্রায় ভুলে যাই রবীন্দ্রনাথের তুল্য কবি ও মানুষ কি এ দেশে কি সাহেবদের দেশে লাখে এক মেলে। শেক্সপিঅরের কাব্যের নাটক-সম্ভব প্রচণ্ড তীব্রতা নিশ্চয়ই এখানে দুর্লভ, কারণ ইঙ্গনেসান্স-এর বাবু সমাজে নাট্য উৎসারিত হয়েছে অনান্তর্জাতিক গ্রাম্যতার মধ্যে। অন্যপক্ষে, দান্তের কাব্যের গভীর রসাভাসের সুগঠিত

বিন্যাস একালের কবির মধ্যে এখন পর্যন্ত আশা করাটাই মূঢ়তা। সৃষ্টিময়তার, বিপুলত্বের দিক থেকে, আবেগের আর মননের মহত্ত্ব ও বিস্তারের যাথার্থ্যে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। তাই টলস্টয়, উ্যগো বা গয়টে কারো মহিমানির্দেশেই রবীন্দ্রনাথের কীর্তির পরিধি বোঝানো যায় না।

সেইজন্যই বোধহয় মনে থাকে না যে আমরা কেউ কেউ যেমন আজ এক লেখক কাল আরেক লেখকের দ্বারা অভিভূত হই বা কোনো ফিল্‌ম্ দেখে আসি এবং হয়তো গল্প বা উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করে ফেলি, সে রকম ত্বরিত আত্মদান রবীন্দ্রনাথের স্বয়ন্তর স্বভাবে প্রয়োজন এবং সে কারণে সহজও ছিল না। কবিকাহিনী-ভগ্নহৃদয়ের সময় থেকেই যে সংকটবোধ ও অস্থিরতা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করেছিল, তাকে তিনি নিজেই পুরুষার্থের বিন্যাসে বেঁধেছিলেন অল্প বয়সেই এবং স্থানকাল মনে রাখলে—অসামান্য স্বকীয়তার বলে। তাতে রামমোহন বিদ্যাসাগরের সমাজমানস, দেবেন্দ্রনাথের পিতৃ-প্রভাব, পারিবারিক আবহাওয়া, ইওরোপীয় অভিজ্ঞতা সব কিছুই কাজ করেছিল, কিন্তু বিন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের ষোলো-সতেরো বছর থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে বাঁধলেন কবি নিজেই। কবি নিজেই, কারণ দুর্মর দায় ছিল এক নিছক কবিস্বভাবের আত্মরক্ষার, নিজের জীবন ও বিকাশের পথকে নির্মাণ করার। এই কবিত্বের তাড়নাতেই তাঁর শান্তি ছিল না কোনো দিন, সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টিতে নয়, সব রকম কর্মৈষণাতেও নয়। কারণ ঐ সংকটের সমাধান ছিল নিত্য করণীয়, ক্রমান্বয়িক, যেমন ঐ সংকটবোধও ছিল নানারূপে পুনর্বৃত্ত। দ্বন্দ্বময় দোলায় তাই তাঁর মন হিন্দু গোঁড়ামিতে প্রতিবাদ করত এক স্বকীয় ব্রাহ্মধর্মীয় ব্যাখ্যানে, এক মানবিকতার স্পষ্ট-অস্পষ্ট আদর্শবাদে ; আবার ব্রাহ্ম সামাজিক আতিশয্যে তিনি হিন্দুর ঐক্যের বৃহত্ত্ব খুঁজে প্রতিবাদ করতে বসতেন। তাই ইংরেজ শাসনে

ও শোষণে তিনি নবজাগ্রত জাতীয়তাকে বাণীমূর্তি দিয়ে বিকশিত করতেন, আবার জাতীয়তার উগ্ররূপে পিছিয়ে গিয়ে তাঁর মানস খুঁজত বিশ্বজনীন মানবিকতা। কিন্তু ঐ দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি কয়েকটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধের আবেগে বেঁধেছিলেন বলেই তাঁর রচনা ও কর্মে বৈচিত্র্য প্রায় অন্তহীন। যে ব্যক্তিস্বরূপের এবং সমাজপরিবার ও যুগের দ্বিধাদ্বন্দ্বে এই অগ্নিবাষ্প অনির্বাণদীপ্তি পেয়েছিল ষাট-সত্তর বছর ধরে, সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের নির্ধারণের সীমাতেই হয়তো তাঁর সাহিত্যিক মহত্ত্ব, তথা কোনো কোনো দিক থেকে সীমানির্দেশ। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে কবিস্বভাব, সারাজীবন প্রচণ্ডভাবে কবিত্বাক্রান্ত। এবং এরকম মৌলিক কবিত্বে প্রতিভা হয়ে ওঠে উদার, বিশ্বজনীন কিন্তু মর্মে মর্মে স্বয়ম্ভর।

তাই ওআর্ডসওআর্থের পক্ষে বা বৃহত্তর টলস্টয়ের পক্ষে মুখ্য ব্যাপার নয় তাঁদের গ্রহণবিলাস। এঁদের মানসে ও এঁদের জীবনে, সমাজে, পারিপার্শ্বিকে ক্রমাগত যোগাযোগে—অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পরিপূর্ণ হয়েছিল এক মৌলিক দিব্যশক্তি, এগোটিস্টিকেল সব্লাইম ও নেগেটিভ কেপেবিলিটির এক চমকপ্রদ আদি একতায়। এরকম কবি তুলনীয় নয় একালের ইঙ্গ-মার্কিন কবিদের সঙ্গে, যেমন পাউণ্ড বা এলিঅট বা মার্কিনফরাসী কবি স্যাঁ-জন পের্স্। এঁদের আমি উপকৃত ভক্ত। তাঁদের কবিতায় আমি নন্দিত, তাঁদের প্রবন্ধাবলীতে শিক্ষিত। এবং তাঁদের বিশেষ কবিধর্মের গুণে সাধ্য-মতো অল্পবিস্তর ঋণগ্রহণ বা প্রভাবের সন্ধানে আমিও ঘুরেছি। সেটা যে শুধু সাহিত্যিক গোয়েন্দাগিরির লোভে তা নয়, এই তদন্তালোচনায় তাঁদের কাব্যের প্রাথমিক সংবেদন বৃদ্ধি পায় আর তাঁদের মানসলোকের বৈশিষ্ট্যও স্পষ্ট হয়, অধিকন্তু লাভ হয় তাঁদের বিস্তৃত অধ্যয়নমননের জগতে কমবেশি আনাগোনার উপকার।

রবীন্দ্রনাথও পঠনপাঠনে কী পরিমাণে নিয়মিত পরিশ্রম

করতেন, তা সকলের জানার কথা এবং তাঁর কৌতূহল ছিল মানুষের নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে বেশ অসাধারণভাবে ব্যাপ্ত এবং নানা কর্ম-ব্যাপারে মনোযোগী। নিশ্চয়ই তিনিও আমাদের মতো চিন্তাখর বই পড়ে তেজিত হতেন, এবং তাঁর স্বভাবে রচনাকার ও পাঠক, দর্শক, ভাবুক সবই অভিন্নাত্মা ছিল ; সেহেতু তাঁর অধ্যয়ন, দর্শন, শ্রবণ, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে নানারকম পরিচয় সব কিছুই তাঁর মনকে আশি বছর ধরে সমৃদ্ধ করেছিল এবং তাঁর বহুবিধ রচনাবলীতে তার সাক্ষ্য মেলে। মুশকিলটা হচ্ছে আমাদেরই অনেকের, আমাদের অধ্যয়নশক্তি পরিমিত, ধী ধৈর্য ও স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট নয়। তাই এক সময়ে একসঙ্গে মনে রাখা শক্ত হয় এই রচনাবলীর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য, আর এই মানসের স্বভাবগৌরবও আমরা প্রায়ই বুঝি না।···কেবলমাত্র প্রভাব বা ঋণ গ্রহণই ধরুন। যদি ভিন্ন ভিন্ন আবিষ্কার কীর্তির একটা তালিকা করা যায়, তাহলে মনে হতে পারে যে এঁদের মতে—সেই সাবেক বাংলায় যেমন কথা ছিল স্বভাবকবি, রবীন্দ্রনাথ বুঝি তেমনি প্রভাবকবি। অথচ প্রায়ই এই প্রভাবের গোয়েন্দাগিরি ভ্রান্ত হয়।

একটি মাত্র উদাহরণ নেওয়া যাক : এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রবীন্দ্র-নাথের গদ্যকবিতা 'শিশুতীর্থ' বিষয়ে। তাতে যথারীতি পাপবোধ, ট্রাজিকবোধ ইত্যাদি তো আছেই, রবীন্দ্রনাথের ঐ সোজা কবিতার সঙ্গে 'এনসেন্ট ম্যারিনর' ইত্যাদির তুলনা ও সুপরিচিত সব বই উল্লেখ পাদটীকা শোভিত অনেক জায়গা জুড়েছে। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ভিত্তিহীন। এই লেখকের রিসার্চ-মতো রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতাটি নাকি এলিঅটের 'দি জার্নি অব দি মেজাই' নামক কবিতা পড়ে তার প্রভাবে লেখেন। অথচ লেখক বোধহয় জানেন না যে ১৯৩১-এ এলেন এণ্ড অনউইন হিবার্ট লেকচারস এবং রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজি কবিতার পুস্তিকা

ছাপেন The Child নামে। কবিতাটি লেখা ১৯৩০-এ। রবীন্দ্র-রচনাবিদ ক্ষিতীশ রায়কে এখানে উদ্ধৃত করি :

২৬শে মার্চ, ১৯৩০	—মার্সাই পৌঁছলেন।
২রা মে	—প্যারিসে প্রথম চিত্র প্রদর্শনী।
১১ই মে	—লণ্ডনে পৌঁছলেন। বিলাতে এসে কবি শুনলেন গান্ধীজীর ডাণ্ডিযাত্রার কথা, চট্টগ্রামের কথা।
১৯ তারিখ থেকে ২৮শে মে	—হিবর্ট বক্তৃতামালা।
২৪শে মে	—কোয়েকরদের বাৎসরিক অধিবেশনে গান্ধীবিষয়ক আবেগময়ী বক্তৃতা।
৩০শে মে	—লণ্ডনে ওয়েজউড বেন সাহেবের সঙ্গে ভারত ও গান্ধীবিষয়ে আলোচনা।
১২ই জুলাই	—জর্মানি পৌঁছলেন।
১৬ই জুলাই	—বার্লিনে চিত্রপ্রদর্শনী।
১৭—১৯শে জুলাই	—ড্রেসডেনে "
১৯—২৪শে জুলাই	—ম্যুনিকে "

ম্যুনিকে থাকতে কবি একটা পুরো দিন কাটিয়ে এলেন ওবের-আমের গাউ গ্রামে। প্যাশন প্লে দেখে যে রাতে ফিরে এলেন, সেই রাতভোর বসে লিখে ফেলেন, 'দি চাইল্ড'—একমাত্র কাব্য যা নাকি মূল ইংরেজিতে প্রথম লেখা। ম্যুনিকে থাকতেই নাকি UFA থেকে অনুরোধ এসেছিল মানুষের জয়যাত্রা বিষয়ে একটি স্ক্রিপ্‌ট যেন কবি তৈরী করে দেন। বলা বাহুল্য, এ অনুরোধ একমাত্র অদ্বিতীয় প্রেরণা হতে পারে না। 'দি চাইল্ড' বই হয়ে বেরোল ১৯৩১ সালে। সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে (তার কিছুদিন আগে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়ে গেছে ; তিস্তার বন্যায় উত্তর বাংলা ভেসে

গেছে) বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে 'দি চাইল্ড'-এর বাংলা সংস্করণ 'শিশুতীর্থ'রূপে কলকাতায় অভিনীত হল।...

১৯৩০-৩১ নাগাদ এলিঅট সাহেবের 'এরিয়েল' কবিতা পুস্তিকা কলকাতায় পাওয়া গিয়েছিল। তার আট নম্বর হল 'জার্নি অব দি মেজাই,' ষোল নম্বর হল 'সিমেঅনের' গান। তারপরে 'পরিচয়' পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেরোল, আধুনিক কাব্য বিষয়ে। সেই বিরোধী প্রবন্ধে তিনি এলিঅটের প্রথমদিককার কবিতা প্রয়োগ করেন। লেখক তখন ক্ষুব্ধ হয়ে আট নম্বর 'এরিয়েল' কবিতাটির যে অনুবাদ করেছিল সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠায়। সে সময়ে গদ্যছন্দ বিষয়ে তার জিজ্ঞাসা ছিল। তাই অনুরোধ করেছিল, কবিতাটি যদি তিনি তাঁর তৎকালীন গদ্যকবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে ঐ ছন্দের স্বরূপটা সে ধরতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে। আমার বন্ধু পরিচয়-সম্পাদক একদিন তাঁকে বলেন, আপনাকে এই সুযোগে অমুক এলিঅটের সাম্প্রতিক কবিতা পড়াল। তিনি বলেন, তাই বুঝি, এলিঅট তো ভালো লেখে, তার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, তুমি ঐ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছাপো। তারপরে তিনি ইংরেজি কবিতাটি এবং অনুবাদটি নিয়ে মিলিয়ে দেখেন এবং সেইটেই হল ১৩৩৯ সালের এলিঅট অনুবাদ। 'শিশুতীর্থ' তার আগের বছরের।

আরেক লেখকবন্ধু নবধর্মীয় উৎসাহের উদভ্রান্ত ও তালিকামার্কা পাণ্ডিত্যের বেগে লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিছক উপনিষদের একেলে মূর্তি, বুদ্ধদেবের একেলে অবতার, ইত্যাদি; তিনি নাকি দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা অনুভব না করেই অর্থাৎ উত্তরণ না করেই বিশুদ্ধ ঔপনিষদ 'আনন্দ'-তেই যেন জন্মকাল থেকেই তাঁর বিরাট রচনাবলীর ও কর্মজীবনের অচ্ছেদ্য ঐক্যের ডায়ালেকটিকে বদ্ধ ও বৈচিত্র্য-

মগ্ন করেছেন। অথচ, সংকট বা ক্রাইসিসবোধ, এই দ্বন্দ্বময় ক্রমিকতাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিস্বরূপের সবচয়ে বড় কথা। তাঁর dark period মাঝে মাঝে যে আসত, খ্যাতির শিখরেও যে তাঁকে আত্মগ্লানি ঠেলা দিত আত্মহত্যার মতো মনোভাবে, সে কথা তো রবীন্দ্রালোচকদের জানা উচিত।

এ প্রসঙ্গে শোয়াইৎজরের ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিষয়ে বইটি উল্লেখযোগ্য। শোয়াইৎজর গত শতকের ভারততাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যার ঝোঁকেই নীরক্ত জীবনবিমুখ ভারতীয় মানসকে প্রাধান্য দেন। পরবর্তী ভারততাত্ত্বিকরা—যেমন ৎজিমর, বোধহয় এ বিষয়ে অনেকটা ভারসাম্য আনতে পেরেছেন। তবু শোয়াইৎজরের মতো অসামান্য মানুষ তাঁর লিবরল ইওরোপীয় মানবিকতার সীমা সত্ত্বেও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন কিভাবে সমাজবিবেকে অস্থির রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের তথা ভারতীয় অধ্যাত্মের মানবিক বিকাশ এনেছেন স্বকীয় নূতন রূপে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বারবার আত্মপরিচয়ের জিজ্ঞাসায় নিজের কাব্যজীবন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনস্মৃতিতে দেখি তিনি বলছেন:

"আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে-যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর-একটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের

সেই র্থএকটা অকুতা অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলা-ঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

"শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুদ্গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্য সম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।

"তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে-শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে—কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষপরিণাম পর্যন্ত যাইতে দেয় না—তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না—এই জন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথী। মঙ্গলকর্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনই তাহাদের বিকার ঘুচিয়া যায়, তখনই তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে—আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

"নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে-সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে-পরিমাণে খাদ্য পাই নাই।...

"আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না,—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যই ইংরেজী সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে।

সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব-একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।...

"অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্য স্বরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না—কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এই জন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম।"

এই প্রসঙ্গেই মনোবিজ্ঞান আর লুথার অথবা আত্মপরিচয় বা সত্তার ক্রান্তিসংকটের সঙ্গে আমাদের মূল বিষয়ের সম্বন্ধ বস্তুতপক্ষে গভীর। বছর সাতচল্লিশ আগে এলিঅট এই কথাই আরেকভাবে, উঁচ্‌কপালে সাহিত্যিকভাবে, বলেন 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক গুণী-পনা' নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধেঃ "কবিতা আবেগের বাঁধ খুলে দেওয়ার ব্যাপার নয়, ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ নয়, ব্যক্তি-স্বরূপ থেকে মুক্তি বা নিষ্ক্রমণ। অবশ্য, যাদের ব্যক্তিস্বরূপ আছে এবং আবেগ আছে কেবলমাত্র তারাই জানে যে এই দুই বস্তু থেকে মুক্তিলাভ বা নিষ্ক্রমণ বলতে কী বোঝায়।"

আমার অক্ষম জ্ঞান সত্ত্বেও (এবং আপনাদের সময় সংক্ষেপের জন্য) উদ্ধৃতিউল্লেখের মধ্যে সম্বন্ধনির্ণয়ের চেষ্টা নির্দিষ্ট রাখলেও জিজ্ঞাসাটা আপনাদের কাছে তুলতে চাই আধুনিকতার সঙ্গে আত্মসচেতনতার মৌলিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে, যে আত্মসচেতনতা অর্জন করতে পারে কিছুমাত্র সার্থকতা, অথবা ভাষান্তরে বলা যায়, কিশোর বা বয়স্ক ব্যক্তিটিরই আততি অর্জন করতে পারে ব্যক্তি-সর্বস্বের অতিরিক্ত কিছু পুরুষার্থ, যদি সেই আততি, সেই জ্যাবদ্ধ

আড়ষ্টতা বা অস্থিরতাই—প্রকৃত ও বৃহত্তর আত্মপরিচয়ের বা আইডেনটিটি-ক্রাইসিসের বা সংকটের বহির্লক্ষণ মাত্র না হয়।

পিকাসো বা ব্রাকের ছবির মধ্যে যে আত্মসচেতনতা, বার্টক বা প্রোকফিয়েফের সংগীতের মধ্যে যে কৌণিক আততি, যে ভাঙন ও পুনর্গঠন, সে আত্মসচেতনতা নিশ্চয়ই শারীরিক বয়ঃসন্ধি-কালে বালকবালিকার আত্মসচেতনতার তুল্য নয়। বলাই বাহুল্য পিকাসোর ছবির কথা বলার মধ্যেই ধরে নেওয়া থাকছে যে পিকাসোর ছবি ছবিই, মহাশক্তিশালী কুশলী শিল্পীর ছবি, পার-দর্শিতার পূর্বের নয়, পরবর্তী এবং সংলগ্ন সচেতনতার কীর্তি। এ অর্থেই মারিতাঁর সেই সুপরিচিত উক্তি : পিকাসোর কাজে দেখা যায় যে আধুনিক শিল্প বা চিত্রকলা হচ্ছে চিত্রকলারই পক্ষে আত্মসচেতন হবার ভয়ংকর প্রয়াস। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজবিন্যাস পশ্চিমা যে উদ্দাম জগতে বছরে বছরে মানুষের মনকে অস্থির করছে, বিদ্রোহী করছে, সমৃদ্ধ করছে, সেই জগতেই ফ্রান্স-প্রবাসী স্পেনের আবাল্য প্রতিভাধর শিল্পীকে সাজে সংকটের এই শিল্পরূপায়ণে ক্রমাগত নিজের আততিকে প্রকাশ করে যাওয়া। হতে পারে যে এই আততিই সময়ে সময়ে পিকাসোতেও সেজে বসে খেলা, খামখেয়ালি, বিস্তর নব্যশিল্পীর মতোই বিকৃতির উদ্দেশ্যেই বিকৃতি। মারিতাঁ এই বিকৃতিবিলাসের সমালোচনা করেছেন তাঁর প্রবীণ বয়সের শিল্পসৃষ্টিকারী অন্তর্জ্ঞানের আলোচনাগ্রন্থে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ইওরোপে এবং অনেকাংশে একই ভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক মনন, শিল্প, সাহিত্য সবই প্রতিভার তারতম্য সত্ত্বেও একটা বিশিষ্ট চেহারা নেয়— সেটা একটা জগতের সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিসত্তার এক তীব্র আধির আকুতির চেহারা। অর্থাৎ নাভাহো আদিবাসীর মানসসংকটের বিশ্ব বস্টন অঞ্চলের ইংরেজের বংশধরের

মানসমন্থনের ঠিক সমান নয়, এবং আমাদের প্রত্যন্তবাসীর মানস-প্রদাহে রবীন্দ্রনাথের অগ্নিবাষ্পের ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যের ব্যাপ্তি নেই, সম্ভবত গভীরতাও নেই। যেমন তাতে নেই যামিনী রায়ের শুদ্ধিসাধনায় দীর্ঘকালের সভ্যতার গ্রাম-প্রধান কিন্তু আধুনিক মননের নির্ভেজাল চিত্রময়তা।

এই বৃহত্তর অর্থে শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার প্রশ্ন তুললে রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকে প্রথমে ভাবাই আমার মতো রাবীন্দ্রিক বাংলার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য রাবীন্দ্রিক আধুনিকতার স্বরূপ বোধহয় তাঁর বহুবিচিত্র সাহিত্য অপেক্ষা চিত্রশিল্পে আপাত-দৃষ্টিতেই এবং অবিমিশ্রভাবে স্পষ্ট। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, একপক্ষে যেহেতু তাঁর সৃষ্টিময়তা অনেক বেশি দীর্ঘকালব্যাপী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং স্বনিয়মনিষ্ঠ ও অভ্যস্ততায় পুনর্বৃত্ত, আবার আমাদের পক্ষে বহুবিধ ঐশ্বর্যে উদ্‌ভ্রান্তিকর, সেহেতু তার বিচারবিবেচনার পর্বে পর্বে এবং সমগ্রতায় সমান দৃষ্টি রাখা কঠিনতর।

সন্দেহ নেই যে সাহিত্যে আধুনিক চিন্তামগ্নতা বাংলা দেশে প্রথম চর্চা করেন রবীন্দ্রনাথ এবং স্পষ্টত দেখতে পাওয়া যায় যে তিনি বেশ অল্প বয়স থেকেই বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলেন নিজের মনের সঙ্গে ব্যক্তি ও বিশ্বের দ্বন্দ্ববদ্ধ একতা বিষয়ে। একটি দুটি উদাহরণে বক্তব্যটা সংক্ষেপে নির্দিষ্ট থাক। 'কবিকাহিনী' ও 'জীবন-স্মৃতির' সাক্ষ্যমাত্র এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'জীবনস্মৃতিতে' পরিণত বয়সের আত্মজ্ঞানে নির্মম কবি বলেছেন ঃ

"এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা

করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই।…ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে, তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠ করিবার সময়ে যখন সংকোচ অনুভব করি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড়ো বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসত্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া গেছে।

"যে বয়সে ভারতীতে লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম সে-বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক—বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই। কিন্তু তাহার একটা সুবিধা আছে; ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার প্রবল মোহ অল্পবয়সের উপর দিয়াই কাটিয়া যায়।

"যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে-একটা উৎসাহের বিস্তার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নয়। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসবের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।"

অচলিত রচনাসংগ্রহের দুটি খণ্ডে এই চিন্তাকুলতা রবীন্দ্রনাথের আসন্ন আত্মস্বরূপের সন্ধানের ও অর্জনের বিস্ময়কর শৈশব-যৌবন-দুহুঁ-মিলে যাওয়া সূচনা। কি কবিতায় কি সমালোচনাগদ্যে এই মহীয়ান তরুণ পুরুষ বা কিশোর মহীয়ান মানুষটি স্বীয় প্রতিভার বিকাশের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন মননশক্তির আশ্চর্য স্বকীয়তায়—আশ্চর্যই, যদি তখনকার বিক্টোরিয়া মহারাণীর বাংলার সাংস্কৃতিক সাধারণ পরিস্থিতির বিষয়ে একবার ভাবা যায়। তিনি

নিজে অবশ্য পরিণতির গম্ভীর মর্যাদায় নিজের বিষয়ে স্বভাবতই লজ্জিত ও নিষ্ঠুর, যেটা তাঁকেই সাজে ; কারণ এরকম আশ্চর্য সূচনা দেখা যায় প্রায়শই হয় জীবিকার মরুপথে হারা অথবা তরুণ ব্যক্তির অকালমৃত্যুতে নিঃশেষ, কারণ আশ্চর্য সূচনা থেকে এরকম ক্রমিক পরিণতির আশ্চর্য দীর্ঘ পর্বপরম্পরা ও নবনব মাধ্যমে ঐশ্বর্যবিস্তার বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এবং বাংলা দেশের প্রাদেশিকতায় কিশোর কবির আত্মপ্রস্তুতির এই ব্যাপ্তি ও নিষ্ঠার অস্থিরতা অবাক করে দেয় ; কারণ একমাত্র মাইকেলে বা বঙ্কিমচন্দ্রেই যা কিছু বয়স্ক সংস্কৃতির চিন্তাশীলতা এবং শৌখীনের অতিরিক্ত সাহিত্যবৃত্তি পাওয়া যায়, তাও উভয় ক্ষেত্রেই বেশ বেশি বয়সে, অমিতব্যয়ী পুত্রের পিতৃ-গৃহে প্রত্যাবর্তনের মতো।

পরিণত যৌবনে রবীন্দ্রনাথই গোটা একটি বই প্রকাশ করেন, যার নামই 'আধুনিক সাহিত্য'। আবার প্রবীণ বয়সে তিনিই লেখেন 'আধুনিক কাব্য' বিষয়ে প্রবলবিরোধী সেই তর্কবহ প্রবন্ধ যা 'পরিচয়' পত্রিকার পাঠকদের উদ্বেজিত করে এবং অন্তত দুজন লেখককে করে আরেকবার ভাবিত।

সম্ভবত এ কথা ঠিক যে এই সব মূল্যবান সমালোচনা প্রবন্ধ যদি কবি রবীন্দ্রনাথ না লিখে নিছক জাত-সমালোচকমাত্র কিংবা সমালোচনাব্যবসায়ী শিক্ষকজাতীয় কেউ অবাক করে দিয়ে লিখতেন, তবে সেই তাজ্জব কাণ্ডে এদের উপযোগিতা ও প্রভাবের তীক্ষ্ণতা হত ভিন্ন। 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' থেকে 'রোগশয্যায়', 'শেষ লেখা' অবধি যে ক্রমান্বয়ে দুর্জয় কবিমানস তথা ব্যক্তিসত্তার বহু-বিস্তৃত একাধারে চৈতন্যের ও রূপায়ণের ক্লান্তিহীন কর্তৃত্বের বিবর্তন, তারই প্রশ্নোত্তরের পটভূমিতে দ্বান্দ্বিক প্রাণময়তা এবং সংকট-বোধ ও উত্তরণের একটি সামগ্রিক প্রকাশ বলেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাবলীর আরেক মূল্য।

একটি দৃষ্টান্তে কথাটা নির্দেশ পাবে। আমার এক বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে Creative Unity নামক তাঁর দিক্‌দর্শী বক্তৃতাবলী প্রসঙ্গে কথায় কথায় কীটসের সেই বহুচর্বিত লাইনটি এসে পড়ল : সুন্দর সত্য আর সত্য সুন্দর। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যসিদ্ধ, এদিকে এংলিকান আর ওদিকে উপযোগবাদী মনে এ কথাটা শৌখীন কাব্যিকতা মাত্র। অথচ কথাটা সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনায় গভীর সত্যের মর্যাদা পায় রাবীন্দ্রিক গীতিকবিতায় : 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্যসুন্দর।' নিশ্চয়ই লাইনটির অর্থবহতা বৃদ্ধি পায় সুরের জন্য, যা আমার গলায় ছিল না। কিন্তু বেশ বোঝা গেল যে আমার কাছে যে বাক্যের সংযুক্ততা গভীরভাবে অর্থবহ, যে ভাবে বোধ্য, তার পিছনে আছে রবীন্দ্রকাব্যের বিরাট দেশকাল, এমন কি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তির বাইরে তাঁর দেশের কালের গোটা ঐতিহ্যের অনুরণন। তাই যা সত্য আর যা সুন্দর তা একযোগে বিরাজ করে আনন্দলোকে এবং আনন্দলোকেই কিন্তু মঙ্গলালোকে। এ রাবীন্দ্রিক আনন্দধারার অনুভূতি সেকালের ইংরেজ কবির একালের দেশের লোকের মনে সমানভাবে ঠাঁই পেল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার ও তত্ত্বের জগৎ এবং কবিকর্ম বা বিশেষ করে চিত্রকর্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে দ্বন্দ্বময়তা কোনো মনোযোগী-ভক্তেরই লক্ষ্য না করে থাকার উপায় নেই। বস্তুত তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা যেমন পৃথিবীতে তুলনাহীন, তেমনি আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর তাঁর মতামতের এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আর শিল্পরচনার মধ্যেই একই মানসদ্বন্দ্বের দ্বিধারা।

কারণ রবীন্দ্রমানসকে বাল্য থেকে, নানারকম সহায়সমর্থনের মধ্যে থেকেও আত্মরক্ষা করতে হয়েছে, একালের মনোবিজ্ঞানের অর্থে আত্মরক্ষা, ইগো-আইডেনটিটির জীবনমরণ সংকট ও সমাধানের প্রয়াসে। অবশ্য অনেক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান ছিলেন

ইওরোপের যে কোনো মহান বালকের তুলনায়। ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় নেতার তত্ত্বজগতে সুনীতিবত্তার উপরে ঝোঁক থাকলেও খ্রীষ্টধর্মীয় পাপ পুণ্য বা দেহবৈরাগ্য ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐহিক-পারমার্থিক মিশ্রতার জন্যই চরম হয়ে ওঠে নি, এবং বৃহত্তর ভারতবর্ষে গোঁড়ামি প্রায়শই সামাজিক আচারে আচরণে সীমাবদ্ধ, মনের বিচারে ততটা নয়। তা ছাড়া ইংরেজ শাসনশোষণে অকর্মণ্য জীবন যেমন নীরক্ত হচ্ছিল, তেমনি আবার প্রতিবাদী স্বাধীনতালিপ্সা সকর্মক আরেক আবেগ জোগাচ্ছিল মানসিক শক্তিসংগ্রহে।

রবীন্দ্রকৈশোরে ইওরোপের প্রত্যাগত ঝঞ্ঝায় যে বিশৃঙ্খলা 'জীবনস্মৃতির' কবিকে বিচলিত সবিতৃষ্ণ করেছিল ইওরোপীয় মনের একই সঙ্গে লুব্ধ কার্পণ্য এবং আতিশয্যের বিরুদ্ধে, সেই উদ্দাম আমদানির বিষয়েও তাঁকে সচেতন হতে হয়। সচেতন হতে হয়েছিল বলেই তাঁর কাঁচাবয়সের মাইকেল-বিরোধিতা, কারণ মাইকেলের প্রতিভার অসম্পূর্ণ বিকাশের ট্রাজেডি ঘটেছিল মুখ্যত রাম এণ্ড হিজ্ র‍্যাবলের এই দেশের জাগ্রত মানসের রঙীন গোধূলিসংকটের জন্যই। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া তাত্ত্বিকতায় ছিল অভ্রান্ত এবং তজ্জনিত বিতৃষ্ণাবশতই তাঁর কাব্যবিচারণার প্রয়োগ হয়ে উঠল প্রায় ভ্রান্তিকর অতিশয়োক্তি, মাইকেল-হেমচন্দ্রের মধ্যে তুলনায়। একদিকে যেমন পরাধীন প্রাচ্যদেশে রেনেসান্স্ রিফর্মেশন হয় নি, তেমনি আবার ঐতিহ্য-গর্বিত এবং বহুজন-বিস্তৃত এদেশে অসহিষ্ণুর আনন্দবিরোধী মনোভাবও প্রাধান্য পায় নি, পণ্যব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্র তখনও বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষস্থানে বসে নি। তাই কিশোর কবির নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিষাদ, তাঁর সংকটের আর্তনাদ বিশিষ্ট চেহারা পেয়েছিল।

'কবিকাহিনী'তে দেখি বালক 'কবি ভাবিত কত কি' ঃ

হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্রে প্রণয়ের জোছনা-পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি ;
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত,
সমস্ত পৃথিবীদেবী পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে।—

হয়তো বয়ঃসন্ধির প্রথম গোধূলিতে এরকম বিশ্বভাবনা কোনো কোনো কিশোরের সুকুমার স্বভাবে সাময়িকভাবে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে এই বিশ্বৈকাত্মতা রবীন্দ্রনাথের মনে আজীবন ভর করেছিল আকাশবাতাসের মতো। এবং বিশ্ববোধ এ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে নিঃশেষ ছিল না, বালকের জানা ছিল যে—"মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।" এবং এ কবি তখনই মন স্থির করেছিলেন ঃ

শুধু দেবি পৃথিবীর হলাহল আছে যত
তাহাই করি নি পান মিটাতে পিপাসা।

তিনি চান নি—"স্বর্গীয় এ হৃদয়ের জীবনে মরণ!"—এবং কবি তখনই বুঝেছিলেন যে ব্যক্তিগত স্বর্গখেলনা রচনার চেষ্টায় সমাধান টিঁকবে না। মানবসমাজের বিশ্ব করাঘাত করে চলে নলিনীর স্বপ্ন ভেঙে জোড়াসাঁকো, বোলপুর, বক্রোটার অলকাপুরীর গজদন্ত-রচিত দ্বারে। চতুর্থস্বর্গ সেই আঘাতেরই কবিত্বরূপ, কাঁচা নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যক্তিগত যাথার্থ্যে আন্তরিক, সত্য।

যা দেখিছ, যা দেখেছ তাতে কি এখনো
সর্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠেনি শিহরি ?
কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া !

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধ কারাগারে
অধীনতাশৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলংকশৃঙ্খল তার অলংকাররূপে
আলিঙ্গন করে তারে রেখেছে গলায় !
দাসত্বের পদধূলি অহংকার ক'রে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা !
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন !
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন সে অধীনেরে দলিবার তরে—
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু !
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল—
দুর্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে !
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।

এবং তিনি ভাবতে পারেন তাঁর সমস্যার বিশ্বগত দিকটার সমাধান, যখন ঃ

অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !
নাইক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা···
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, কেহ কারো দাস।···

এবং সমাধানের ছবি হয়ে ওঠে হিমালয়গম্ভীর শুভ্রশান্ত গরিমা এবং নিজ পিতৃদেবের অন্তরস্থ মূর্তি হয়ে ওঠে কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক শেষ চিত্র ঃ

> বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
> নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি, গম্ভীর মূরতি,
> প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
> মনে হয় হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃদেব !

ওআর্ডসওআর্থের 'প্রেলিউড' নামক দীর্ঘ কবিতাটি পৃথিবীর কাব্যে অতুলনীয়, তার কবিত্বের অভূতপূর্ব গভীরতা মর্মগামী, মনের বিকাশের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির ঝলকে তার আকাশ মনোবিজ্ঞানের আলোকিত পূর্বাভাস। কবিতা হিসাবে "এক কবির মনের বিকাশ"-এর কবিতা অসামান্য কীর্তি এবং মানবজীবন ও মনের বোধিতে অন্তরঙ্গ আলোকপাতে ওআর্ডসওআর্থ পুরোধা। কিন্তু ছোট পরিসরে, নতুন ভাষায় কাঁচা কবিতার অস্পষ্টতা ও অপটুতা সত্ত্বেও 'কবিকাহিনী' অন্তত রবীন্দ্রকাব্যপরিচিতিতে প্রথম আলেখ্য। 'কবিকাহিনীর' মূলসূত্র কটিই, মোটামুটি বলা যায়, আতিশয্য সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বিকাশের মৌলিক প্রতিভাস। 'কবিকাহিনী'র অপরিণত, কবির স্বয়ং-নিন্দিত কবিত্বতে দেখা গেল কবিতারূপেই তাঁর ভাবনা-জগৎ, তত্ত্ববিশ্ব বা আইডিওলজির স্থিরবিন্দুতে নিজের সংকটযন্ত্রণাকে রূপদানের কিশোর চেষ্টা এবং ঐ রূপায়ণের মধ্যস্থতাতেই আত্ম-সচেতনতা অর্জন অর্থাৎ নিজ উত্তরণের বিন্যাসগঠন। আইডিওলজি বা তত্ত্ব বলতে মনোবিজ্ঞানে বোঝাচ্ছে একটা অবচেতন প্রবণতা যা থাকে ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনৈতিক চিন্তা ও মতবাদের ভিতে, যে প্রবণতা বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে বাস্তবকে, তথ্যকে মেলায় ভাবের সঙ্গে এবং ভাবকে মেলায় তথ্যের সঙ্গে, যাতে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এমন এক বিশ্বচিত্র বা মূর্তি যার আস্তিক্যের প্রাবল্যে আইডেন-টিটির যৌথ এবং ব্যক্তিক বোধ দুই-ই সমর্থনযোগ্য হতে পারে।

বলাই বাহুল্য এই আত্মসচেতনতা অর্জনে তাঁর দেশ ও কাল, তাঁর দুর্গত সামাজিক পরিস্থিতি, পারিবারিক পরিবেশের আভিজাত্য ; মাতা-পিতা, বিশেষ করে পিতার কঠিন কিন্তু সহানুভূতি-কোমল প্রভাব ; তাঁর অগ্রজেরা, বিশেষত একপক্ষে জ্যোতিদাদা ও মেজদাদা আর বৌঠানেরা এবং গুণেন্দ্রনাথ ; অন্যপক্ষে হেমেন্দ্রনাথের কড়া শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বড়দাদার ব্রহ্মচর্য বিষয়ে আকস্মিক উপদেশ এবং ইওরোপীয় জীবনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর সন্ত্রস্ত গোঁড়া তর্ক—এ সবই কমবেশি কাজ করেছিল। কাজ করেছিল অসাধারণ নন্দনময় তরুণ মনের স্বাধীনতার সঙ্গে যোগ-বিয়োগে, মিশ্রণে, সংগঠনে। যেমন ধরা যাক, দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যবিষয়ে অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক নন্দনের কাছে আত্মদানের বিপদের কথা, যা নিশ্চয়ই আসন্নযৌবন বালক কবিকে হতচকিত করেছিল—যদিচ কবি নিজে অনুজের কৃতজ্ঞ উদারতায় বলেছেন যে, এই সতর্কবাণী তাঁকে পরে পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবে মন ভিন্ন ছিল না নন্দনময় ইন্দ্রিয়ানন্দ থেকে।

বস্তুত এই নন্দনপ্রিয়তাই তিনি আইডিওলজিতে বাঁধেন পৈতৃক ঔপনিষদ আনন্দতত্ত্বের আচারহীন নিরাকার সমর্থনে। এবং এই গ্রন্থিবন্ধনে তাঁর চেষ্টা ছিল স্থিতাবস্থ হস্তপদহীন তাত্ত্বিকমাত্র নয়, ছিল সৃষ্টিকর্মে জঙ্গম প্রাণবন্ত বিবর্তমান ঃ

আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ়বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেক দিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ

আকার ধারণ করে উঠেছে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে—অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।" ১৮৯৪; জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয় অংশে উদ্‌ধৃত।

উপরের উদ্‌ধৃতিতে কবি আশ্চর্য অন্তরালোকনে যে কথা বলেছেন, সে সত্য অনেক কবির বা শিল্পীর কমবেশি অভিজ্ঞতা হলেও অনেকে এই প্রক্রিয়া বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো সচেতন থাকেন না। রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবেই ছিলেন, তাই তাঁর পত্রাবলী কীটসের মতোই মূল্যবান অপিচ অনেক বেশি বিচিত্র ও ব্যাপ্ত, ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতার মতো সাহিত্যের জাগ্রত বুদ্ধিকে তিনি তাই কবিতায়, আত্মজীবনীমূলক চিন্তায় নানা ভাবে পরিতৃপ্ত করেন। দা ভিঞ্চির নোটবুকে, দেলাক্রোয়ার রোজনামচায়, ভানগঘের বা সেজানের চিঠিপত্রে এরকম আত্মসন্ধানের পরিচয় মাঝে মাঝে ঝল্‌সে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহান্ শিল্পীর কর্মার্জিত বোধিতে ঠিকই বলেন যে, ঠাকুরবাড়িতে প্রতিভা ছিল অনেকের, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ—অনেকের, কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বীয় শিল্পকর্মকে গ্রহণ করেন 'পেশা' হিসাবে, বৃত্তি বা প্রোফেশন হিসাবে। এবং এই ব্রতগ্রহণে তাঁর পরিবেশ যেমন সাহায্য করেছিল, তেমনি এই পরিবেশের বিপক্ষে কবিকে সংগ্রামও করতে হয়েছিল প্রায় মধ্যবয়স অবধি। এবং সে-সংগ্রাম বাস্তবতা পেয়েছিল দৈনিক শিল্প-কর্মে, এবং জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক সমগ্রতায়, নিত্যনৈমিত্তিক নিষ্ঠায়।

এরিকসনের ভাষায় যে ritualisation of his work-life-এর মধ্যে (Psychological Issues) তরুণ বর্নার্ড শ নিজের সত্তাবিকাশের পথ রচনা করলেন, রবীন্দ্রনাথও নিজের স্বভাবানুসারে এবং বহুবিচিত্র কর্মজীবন অনুসারে স্বকীয় পরিণতি সংগঠিত করেন

এই ব্রতানুষ্ঠানের বা কর্ম-সাধনার নিত্যঅভ্যাসে। ‘কবিকাহিনীতে’ যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া দেখে আজকে সমস্ত রবীন্দ্রোত্তরাধিকার ভোগ করে আমরা মুগ্ধ, মহাকবি নিজে ন্যায্যতই বিনয়ের আত্মগ্লানিতে তাঁর সেই সতেরো আঠারো বছর বয়সের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছিলেন রাশি রাশি কুয়াশা, যেটা তখনকার জলহাওয়ায় ছিল স্বাভাবিক। কিছুকালের মধ্যেই অবশ্য, ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’-এই তিনি প্রথম কাব্যিক স্বকীয়তার সন্তোষ বোধ করেন, অভিজ্ঞতা ও কাব্য রূপায়ণের পরিণতি উভয় কারণেই। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল, আত্ম-পরিচয়ের কৈশোর-সংকট ও পরিণত বয়সের যে সংকট আসে স্বভাবকৈবল্যের বা ইনটেগ্রিটির সাধনে, এ-দুয়ের মধ্যে সংক্ষেপের রাস্তা নেই, সংক্ষেপ বা সহজ পথ খুঁজতে গেলে ডুবতে হয় প্রলয়-পয়োধির বিশৃঙ্খলায় অথবা ধর্মীয়তার অন্ধ গোঁড়ামিতে—যদি না তিনি কৈবল্যসাধনে পেয়ে যান মনন বা শিল্পবৃত্তিক কোনো প্রকাশবাহন, যে আধেয়-আধারের গতিশীল নিয়ম তাঁকে উত্তীর্ণ করে দেয় চরম নেতির ওপারে।

এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব হল প্রিয়বাবুর সঙ্গে এবং গঙ্গাতীরের তরুণ সুকুমার স্বাধীন কিন্তু দ্বিধান্বিত কবির বিচরণ বৃহত্তর মুক্তি পেল বিশ্বসাহিত্যের খোলা দরবারে, আত্মপ্রত্যয় পেল বিপুল ও নিরবধি বিশ্বসাহিত্যের সজ্ঞান সমর্থন। রবীন্দ্রনাথ তখন থেকে সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানবেতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজের—“এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে” পারলেন। “তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব-ছবি দেখতে পাই—দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা

সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত আছি—সুখে আছি।…দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না, নিজের মনের আদর্শ অন্য-লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।" জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়।

অবশ্য ইওরোপের সাহিত্য-সম্ভোগে অবাধমুক্তিই একমাত্র সহায় ছিল না, রবীন্দ্রজীবনে কয়েকটি মৌলিক অভিজ্ঞতা, সংকট-ক্রান্তির রূপান্তরপ্রক্রিয়া তাঁর সারস্বত স্বভাবকে অভ্যাসিকতায় সাহায্য করে মানস-সংগঠনে, তাঁর আইডিওলজির সৃষ্টিময় ঐক্য-বোধের সবল আস্থায়, বিশ্বাসের আইন ফেস্তে বুর্গে বাসা গড়তে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল এই জগতের বিষঙ্গোত্তর প্রান্তদেশেই—যেখানে "গাধার বাচ্ছাকে দেখিয়া একটি বাছুর আসিয়া তাহার ঘাড় চাটিয়া দিতে আরম্ভ করিল" এবং কবি শুনলেন "একটি বিশ্বব্যাপী রহস্যবার্তা বুকের পাঁজরগুলার ভিতর দিয়া।" তাই বিনাদ্বিধায় রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন যে, "এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের মানসের নির্জন ও নিস্তব্ধ জায়গায় ব্যক্তি ও কবি অভিন্ন, যেমন অভিন্ন কবি ও কর্মী ও দেশসেবক; এবং স্বীয় সত্তার আত্মোপলব্ধি তাঁর পক্ষে রীতিমতো ধর্মীয়তায় সম্পূর্ণ হতে পারে না, পারে আর্টিস্টের স্বধর্মপালনে, শিল্পভাষায় অভিজ্ঞতার দ্বৈতাদ্বৈত উপলব্ধিতে। ভারতীয় নিছক মরমিয়া ধর্মীয়তায় তাঁর ঈসথেটিক বা নন্দনজীবী সত্তা পীড়িত বোধ করত, যেমন বিপরীত-

দিকে করত শেক্স্‌পিঅরের স্বার্থভিত্তিক ব্যক্তিতান্ত্রিক লুব্ধ সমাজের উদ্দাম নাট্যে বা আবার কীটসের সর্ববিসর্জনকারী সৌন্দর্যভোগের কবিত্ববিলাসের প্রতিক্রিয়ায়। তাই আজন্মসম্ভ্রান্ত, ভারতীয় কিন্তু বিশ্বমানবিক, ধর্মীয় কিন্তু নন্দনজীবী প্রসাদে আনন্দবাদী, আমাদের আগতপ্রায় জাতীয় পুনর্জন্মের পিতৃস্থানীয় এই কবি, দেখা যাচ্ছে, মার্টিন লুথারের সমধর্মীয় নন, অথবা টমাস মূরের। গান্ধীজির সঙ্গে, ভেবে দেখলে, তিনি অমর্ত্য চারিত্রিক দীর্ঘকায়তায় নিশ্চয়ই তুল্য, কিন্তু তাঁরই ইওরোপীয় বিশ্বমানবিকতায় পুষ্ট বলে আমাদের বরঞ্চ চেনা মানুষ লাগে ভারতসত্তা আবিষ্কারে নিজ সত্তার সন্ধানী অনেক মর্ত্য মানবিক নেতা, সাহিত্যিক স্রষ্টা না হলেও সাহিত্যিকমনা, মোতিলাল নেহরু সাহেবের ছেলে জবাহরলালকে। অবশ্য পণ্ডিত-জীর কর্মমাধ্যম ছিল, মুখ্যত সাহিত্য শিল্প নয়, বিমিশ্র রাজনীতি এবং মিশ্রতর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালন। এবং শিল্পসৃষ্টির নির্দিষ্ট জগতে সংগ্রাম অনেক বেশি শুদ্ধ ও স্বাধীন।

আসলে যে কথা রবীন্দ্রপাঠক মাত্রেই জানেন, অন্তত জানা উচিত, যে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে জীবন, কর্মময়তা, সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই সমানে দেশের অতীত ও সমকালীন বহু নদীর স্রোতে বারবার নেমে তাঁর সমুদ্রপ্রতিবেশী হ্রদে দিয়েছেন ঐশ্বর্য, তেমনি খুঁজেছেন ইওরোপের, বিশেষত আমাদের কাছে ইওরোপের সুলভতম মুখপাত্র ইংরেজের সাহিত্যে ও চিন্তায় অনেক নৌকার নিশানা। তাঁর পক্ষে এই সন্ধান ও সঞ্চয় কোনোটিই বোধহয় খুব সহজ ছিল না এবং সহচর ছিল কমই। আশু চৌধুরী বা প্রিয়নাথ সেন তাঁকে সাহচর্য দিয়েছিলেন অল্পকাল মাত্র। প্রমথ চৌধুরীর তরুণ বয়সে রবীন্দ্রপাঠে যে বোধ ও জ্ঞানের প্রাখর্য রবীন্দ্রনাথকে আলোচনায় উন্মুখ করেছিল, তাও আর পূর্ণাঙ্গ হল না। ইন্দিরা দেবীও কবিকে নানা জিজ্ঞাসায় মুখর

করেছিলেন প্রথম বয়সে, জাগ্রত প্রশ্নোত্তরের সে স্নেহসম্পর্ক স্থায়ী হয় নি।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁর বিদগ্ধ বিশ্বজনীন শালীনতা এবং অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপের শক্তিশালী কিন্তু অভূতপূর্বভাবে সুকুমার হৃদয়বৃত্তি বা সংবেদনশীলতা যা তাঁর ক্ষেত্রে একপক্ষে আধ্যাত্মিক পর্যায় থেকে অভিন্ন এবং অন্যপক্ষে তাঁর শিল্পীস্বভাবের নামান্তর,—এর কোনোটিই তাঁকে দেশজ আত্মীয়তার সহজপথে অথবা অন্যপক্ষে পশ্চিম ইওরোপের অন্তহীন প্রশ্ন ও উত্তরের নেতি-নেতি-তে গা ভাসাতে দেয় নি। তাঁর জীবনদেবতার বা ব্যক্তিসত্তার সতর্কতা অন্তর্যামী অবচেতনে ছিল দুর্মর, প্রচণ্ডভাবে একনিষ্ঠ এবং সেই স্বধর্ম প্রতিষ্ঠায় ও বিবর্তনে তাঁর স্বভাবের ছিল না বিশ্রাম।

এবং মহর্ষির পরিবারে যুবক-কবির 'কড়ি ও কোমল'-এর যে অভিজ্ঞতার দুঃসাহসিক রূপদানের কৃতিত্ব তা আজকের যুবকের পক্ষে কষ্টকল্পনার বিষয়—'ভানুসিংহের পদাবলী'-জাতীয় ছদ্মবেশের প্রশ্রয় না নিয়ে বাংলা ভাষায় সরাসরি মানবিক অভিজ্ঞতাকে প্রথম ব্যক্তিগত রূপদানের কৃতিত্ব। মানুষের মাঝে এই সুন্দর ভুবনে রচয়িতা এবং পূর্ণযুবা রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রণা এবং সৃষ্টিকার্যের রূপান্তরের মধ্যে উত্তরণের প্রকৃতি বা তার গুরুত্ব আজকে রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় পুরুষের যুগে আমাদের কল্পনা করে ভেবেচিন্তে হৃদয়ংগম করতে হয়। এবং বিড়ম্বিত দেশে দিনগত পাপক্ষয়ের মানবিক মাহাত্ম্য সৃষ্টিতে তাঁর সহযাত্রী প্রায় কেউ ছিলেন না তাঁর অগ্রজদের মধ্যে অথবা সমসাময়িকদের মধ্যে, এবং অনুজেরা তখনও নিরুদ্দেশ। এক বোধহয় ছিলেন অগ্রজদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়। এবং বিদ্যাসাগর তাই আজও প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁর মানবিকতার শুদ্ধহৃদয়ের জন্য, তাঁর বহুবিধ কর্মময়তার জন্য, তাঁর সাহিত্যোচিত ছন্দময় ভাষা রচনার জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর মূলত শিল্পস্রষ্টার নন্দনলোকের বাসিন্দা

ছিলেন না ; তাঁর অনুকম্পায় নিঃসঙ্গ মহত্ত্ব সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের রূপান্তরে উদ্‌ঘাটিত হল না, নিঃশেষিত হল সর্বসাধারণের শিক্ষা-দানের প্রাথমিক মহৎ প্রেরণায় ও পরিশ্রমে। তাঁর স্বকীয় চৈতন্যের একাকিত্ব তাই আরও করুণ।

সেই কারণেই বিদ্যাসাগর প্রথম ভাগ বর্ণ পরিচয় থেকে সীতার বনবাস, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা বা ভ্রান্তিবিলাস, বিধবাবিষয়ক প্রস্তাব বা বাংলাদেশের ইতিহাস—বহুবিধ আদি রচনাকার্যে অমর হয়ে থাকলেও যেমন নিছক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের অবসর পান নি, তেমনি তাত্ত্বিক দিক থেকে মহামনীষী চারিত্র্যে গভীর মৌনব্রতে শালীন। স্বদেশের ধর্মীয়তা অথবা বিদেশের উপযোগ-বাদ, প্রয়োজনসিদ্ধিবাদ ইত্যাদি তৎকালীন বাণিজ্য-সাম্রাজ্যবাদের কোনো তাত্ত্বিকতাই তাঁকে বিশ্বাসে অবিশ্বাসে বিচলিত করে নি, এমন কি করেছে কিনা তা প্রচার করবার প্রয়োজনবোধও করেন নি, এমনই তাঁর ব্যক্তিসত্তার নৈর্ব্যক্তিক মানবিকতা বা নিঃসঙ্গতা। মনন ও হৃদয়বত্তায় অর্জিত তাঁর নিষ্কামধর্ম, বা বলা উচিত নিষ্কাম মানবিকতায় তিনি আমাদের অনন্য মহাজন। তাই গীতার কৃষ্ণ-চরিত্রের রহস্য তাঁকে আদালতের প্রতিক্রিয়ায় মাতায় নি। তিনি ভারতীয়তার চিরাচরিত আস্তিক্যে আস্থা রাখতেন কিনা অথবা তিনি নাস্তিক ছিলেন কিনা, বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাঁর সভ্য প্রশান্তিতে ধর্মীয় নেতার প্রশ্নে তাও জানাবার দরকার দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ যে একাধিকবার ও বিস্তৃত মনোযোগে এই পূর্বসূরীর জীবনকর্ম আলোচনা করেন সে তাঁর নিজেরই বিকাশের জিজ্ঞাসার গরজে। এ ছাড়া বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার বিশেষ একটা ফলপ্রসূ হয় নি, বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অপিচ প্রাদেশিক প্রতিভাতেও নয় ; হয়তো পরোক্ষে দু-এক দিক থেকে হয়েছিল রমেশচন্দ্রে।

বিদ্যাসাগরের এই সীমানির্ণীত নীরবতা মুখর কবির পক্ষে

নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হত, যেমন হত টমাস মূরের আত্মসমস্যার স্বল্পভাষিতা মার্টিন লুথারের পক্ষে। প্রবল সাহিত্যস্রষ্টার ব্যক্তি-স্বরূপেই নিশ্চয় নানা প্রশ্ন উঠত এবং তার অনেকখানি সবাক্ সাহিত্যিক ভাবেই হয়ে উঠত তাত্ত্বিক এবং পারমার্থিকও বটে, না হলে তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং অধিকন্তু বিশ্বজনীন যেসব সমস্যা তাঁর মনকে কুণ্ঠিত করে তুলত, তাতে তাঁর সাহিত্যস্বভাবও হত ব্যাহত,—যেমন হয়েছিল এবং তুলনাটা নিতান্তই নির্দিষ্ট, তরুণ র‍্যাঁবোর ক্ষেত্রে বা বিপরীতে একালের ভালেরির আঙ্কিক বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে। তাই রবীন্দ্রনাথকে দেশ ও ইওরোপ, হিন্দুসভ্যতা ও ব্রাহ্মসংস্কৃতি, কর্মব্রত ও রাজনীতি, সমাজসাধনা ও নির্জন নিস্তব্ধতায় আত্মরক্ষণ বা ক্ষীণ প্রাণের পক্ষে যা হত পলায়নী-বৃত্তি—নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে একটা মানসজগৎ গড়তে হয়েছিল বহু-ধারা-সঞ্জীবিত কিন্তু মুখ্যত একক তত্ত্বের হৃদয়-অরণ্যে, যেখানে আনন্দরূপ, অমৃত, অনন্ত, সত্য, সুন্দর, মঙ্গল প্রভৃতি বাধ্যতই অস্পষ্ট কিন্তু সৃজনশীল নিশ্চিতি দিতে পারত, যে নিশ্চিতির বোধে রবীন্দ্রনাথের অসীম, অনির্বচনীয় ইত্যাদি ধারণা কুৎসিত বিশৃঙ্খল অসম্পূর্ণ কবিস্বভাব-বিদ্বেষী বাস্তবের চেয়ে সত্য ও নিরাপদ।

সৌন্দর্যস্রষ্টার ঐশ্বর্যে যিনি অতুলনীয় তিনি যদি বাস্তবকে, প্রয়োজনীয়কে, প্রবৃত্তির স্থূলতাকে বারবার প্রতিবাদের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন তাঁর ন্যায়বিশ্বের দ্বন্দ্বময়তায়, তাহলে তার কারণ ছিল ভয়ানকভাবে সত্য—কি তাঁর বাস্তবজীবনের পরিবেশে কি চিন্তার উপপ্লবে। আজ যদি কারো অপ্রাসঙ্গিক বা কৌতুককর মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ তত্ত্বালোচনা, তার কারণ আধুনিক জগতে নানা জ্ঞানের বিকাশ ও সুলভতা এবং সংলগ্নতার দিকে ঝোঁক এবং তার কারণ সঙ্গে সঙ্গে রাবীন্দ্রিক উত্তরণশীল সংগ্রামী উত্তরাধিকারই অন্তত আমাদের সাবালক চিন্তাজগতের মস্ত নির্দেশক। আজকের

দিনে বিজ্ঞান, বিশেষত শারীরমনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদিতে যেসব প্রশ্ন সমাধানের পথে যাত্রী পরস্পর-সংলগ্নতায়, রবীন্দ্রনাথের কালে তাই ছিল উগ্র, অসংলগ্ন, অসমাধ্য। তাই তাঁর মনে হত, "জগতে সৌন্দর্য বলিয়া এই যে আমাদের একটা উপরি পাওনা,"—যদিচ উপরি পাওনার প্রশ্নই ওঠে না আধুনিক মনস্তত্ত্বে বা জীবনদর্শনে, যেমন নজরানা সেলামি বা খাজনা মকুবের কথা ওঠে না জমিদারি না থাকলে। কারণ সৌন্দর্যের একান্ত প্রয়োজন দেহের মনের অখণ্ড বিকাশে, জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতায় যা অপরিহার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লড়তে হচ্ছিল নিজের সত্তার গরজে, কবিত্বের গরজে, মিল-বেন্থামী কোঁৎ-স্পেন্সরীয় বিচ্ছিন্ন প্রয়োজনবাদের স্বার্থসিদ্ধির ইতিবাদের শূন্য আমদানির বিরুদ্ধে, আবার ধর্মীয় সৌন্দর্যভীতির বিপক্ষেও।

এই বিসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন দ্বৈপায়ন তাত্ত্বিক আবহাওয়ার জন্যই প্রশ্ন উঠত, তাহলে কি সৌন্দর্যবোধের কোনো স্বায়ত্বশাসন নেই? অনেক চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন: "তেমনি সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনওই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ, চিত্তের অসংযমের সঙ্গে একক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে না।" অথচ রবীন্দ্রনাথ বারবার দেখতে পেতেন যে টিঁকতে পারেও বটে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সেই সব রূপ-প্রতিমা, তাঁরই উপমাগুলি—চাঁদ, মেঘ, গোলাপ ফুল, সানাই-এর সুরে মেশা নববধূর চেহারা—এসবই বিস্তর লোকের ভালো লাগে, সত্যই ভালো লাগে, আবার তাঁরাই পরের মুহূর্তে ব্যবসার দপ্তরে, আপিসের গদিতে মানুষের গলা কাটতে পারেন, তাঁরাই নানা-প্রকার খারাপ কার্য করে থাকেন। সৌন্দর্যবোধ যে মনের একটা স্থায়ী অভ্যাস, অভ্যাসের স্থায়িত্বের আজীবন সাধনা সে কথা মনে রাখার জন্য সাইকো-থেরাপি অথবা মারিতাঁ বা তাঁর গুরু একো-আইনাসের উদ্ধৃতি লাগে না। অথবা ডিয়োটিমা এই অভ্যাসের

সাধনাসোপানের যে কথা সক্রেটিসকে বলেছিলেন তারও পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। কিন্তু এ অভ্যাস ন্যায্যতই চায় তার ধ্যানধারণার সাধনার জন্য সুস্থ পরিবেশ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বতোভাবে উপযুক্ত বিশ্ব।

বস্তুতপক্ষে মানবসমাজের বিচিত্র অখণ্ডতার মতোই শতঝুরি মনেরও বটবৃক্ষ অখণ্ডতা বা বৃত্তিগুলির জীবন্ত বা অর্গানিক সংলগ্নতা না মানলে এই সৌন্দর্য বনাম দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনসিদ্ধি বা সৌন্দর্য বনাম প্রবৃত্তির বিক্ষোভ ইত্যাদির সমস্যা থেকে যায় বহিরঙ্গ নীতি হয়ে। মানতে পারলে বিরোধ বা অসম্পূর্ণের দ্বন্দ্ব হয়ে যায় কিছুটা স্বভাবনিহিত, কিছুটা আপতিক বাইরের ব্যাপার, সুতরাং উভয়পক্ষেই কমবেশি সাধ্যানুসারে রূপান্তরিত করার সমাধ্য স্তরে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে এই সৌন্দর্য ও মঙ্গল ভিন্ন হেঁশেল হলেও আত্মীয়। "তবু মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে।" ঐ দ্বন্দ্বেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি,—আপনাদের পক্ষেও দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পরবর্তী যুগের চিন্তার আরেক অর্থে। রবীন্দ্রনাথকে এই রূঢ় সত্য আহত করেছে, কারণ সৌন্দর্যের মতোই মঙ্গল তাঁর কাছে একটি বিশুদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক সত্য, অ্যাবস্ট্র্যাকশন। যেমন করেছিল পশ্চিমা অর্বাচীন কীটসকে। রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিক পরিণতির গুণে কীটসের আংশিক উপলব্ধিকে সম্পূরণ করেছিলেন আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে যেখানে বিরাজমান সন্ধিবদ্ধ সত্যসুন্দর। সৌন্দর্য এঁদের কাছে স্বতই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ, সৌন্দর্য সাধনার পর্বপরম্পরা ও দ্বন্দ্বোত্তরণ তাই এ তত্ত্বে গৌণ থেকে গেল, সক্রেটিসের মতো সরাসরি মনে হল না সৌন্দর্য সাধনার চরম লক্ষ্যস্থলে কুৎসিতও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের পরিণতিতে তাতে খুব অসুবিধা হয় নি, তাঁর আনন্দরূপের শেষ পর্যন্ত পারমার্থিক কৈবল্যের সহায়তায়। তা ছাড়া গানে সত্যকথা বলা যায় গদ্যের চেয়ে তো বটেই, কবিতার

চেয়েও অনেক সহজ মর্মস্পর্শিতায়। চিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার পিছুটান বা গচ্ছিত লগ্নি—ভেস্টেড ইনটারেস্টস্ বাদ দিয়েই ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তাই সেখানে কুৎসিতও সুন্দর, সজ্‌নেডাঁটা ও গোলাপ-ফুল সমান সুন্দর, সুন্দরী মেয়ে ও উট দুইই রূপায়ণের বিষয়। সার্ডিনমাছ বা সজনেডাঁটার বিষয়ে সৌন্দর্যবাদী ছুঁৎমার্গ যে কবিকে বিড়ম্বিত করত, চিত্রকলা তাঁকেই দিলে জাত-বেজাত থেকে মুক্তি।

এবং সিদ্ধির বৃদ্ধবয়সে স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ং-অভিভাবক মননে পৃথিবীর হালচাল-সাহিত্যিক, চৈত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বিশ্বতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক—সবকিছুই তাঁর চিরসজীব মনকে অনুপ্রেরিত করল অপাংক্তেয় নানা বিষয় পরিগ্রহণে। অবশ্য প্রায়শই যুক্তিসঞ্জাত গদ্য কবিতার পঙ্‌ক্তি ভোজনে, অগোচর প্রেরণার তরল পদ্যছন্দে নয়। আগে নিছক ব্যাখ্যা গদ্যে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিলঃ "আমাদের সৌন্দর্যবোধ সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখ-কর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।"…"তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে।"—সামাজিক নৈতিক সংলগ্নতা মানবিক রবীন্দ্রনাথ একেবারে বাদ দিতে পারেন না, তাঁর পরিবেশ ঠিক সেকালের আথেনস্ নয়, যেখানে ৬,০০০ স্বাধীন ভদ্রলোক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচর্চার সুযোগ পেত এবং বাকি ৪,০০,০০০ লোক করে যেত জীবনযাত্রার স্থূল কাজকর্ম। অপরপক্ষে রাবীন্দ্রিক আনন্দামৃতের চর্চা সমুদ্রবণিক গ্রীকরা করে নি।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির নৈতিকতা ও ন্যায্যতা সহজেই বোঝা যায়; যদিও মনে হতে পারে সৌন্দর্যধ্যানের, সুন্দরসাধনার দিক থেকে, ঈসথেটিক্ বা নন্দনতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতার দিক থেকে ডিয়োটিমার

নির্দিষ্ট প্রস্তাব আরো ব্যক্তিপ্রধান, সমাজাতিরিক্ত, সহজিয়া, কিন্তু স্বসম্পূর্ণতায় আরো অন্তরঙ্গ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি কি পরস্পর ব্যক্তি-জীবনেরই মানসে, ব্যক্তির চৈতন্যেই বিচ্ছিন্ন? এই বিচ্ছিন্নতার চেতনাতেই ও বহুধাবিভক্ত ব্যক্তিস্বরূপের সুখদুঃখে ইওরোপে সপ্তদশ শতক থেকে এল চিন্তার নবজাগরণ, সংলগ্নতার স্মৃতি ও আশায় অসংলগ্নের অস্থিরতা, তাই আয়রনির বা ব্যঙ্গ বা দ্ব্যর্থমূলক বক্রোক্তির ঘনতা। তারপরে রোমান্টিক প্রতিক্রিয়ায় এল "প্রায়-রাবীন্দ্রিক, স্মরণীয় যে মাত্র প্রায়-রাবীন্দ্রিক মেজাজেই এল অসীম, সুদূর, অজানার নির্ঝঞ্ঝাট মাহাত্ম্যকীর্তন।

রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন যে আধুনিক যুগ বলতে তিনি বোঝেন ওআর্ডসওআর্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটসের যুগ, তখন তাঁর বক্তব্যটা বোঝা শক্ত নয়। অথচ তাঁর কাছে কেন ওআর্ডসওআর্থের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের কাব্য যথেষ্ট মর্যাদা পায় নি, তাও বোঝা শক্ত নয়। ডাইড্যাক্টিক সৌন্দর্যের ভক্ত, ফরাসীবিপ্লবে উৎসাহিত, পরে বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে কুণ্ঠিত ওই ইংরেজ কবির অভিজ্ঞতার নিসর্গপ্রকৃতি নিষ্ক্রিয় সৌন্দর্যের অবাঙমনসাগোচর ব্রহ্মবৎ নয় (গান ওআর্ডসওআর্থ লেখেন নি, রবীন্দ্রনাথই আজীবন আশ্চর্য কথায় ও সুরে লিখে গেছেন!); ইংরেজ কবির প্রকৃতি প্রতিবেশী মানুষের পক্ষে মর্মভেদী সকর্মক শক্তি; যেমন সকর্মক নবজাত দুগ্ধপোষ্য শিশুরও মন, যা খেলার মধ্যে দিয়ে, পানাহারের জৈব প্রয়োজন সাধনের মধ্যে দিয়ে, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সক্রিয় সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে পায় মাতাকে,—নিকটাত্মীয়দের, প্রকৃতিকে, বিশ্বকে পায় নিজের সত্তা-চৈতন্য বিকাশ পাওয়ার সংলগ্ন প্রক্রিয়ায়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি অসাধারণ বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যে অতুলনীয় কথা ও সুরের ইন্দ্রজালে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে, আমাদের কানে কানে প্রকৃতিকে আপন করে ঘনিষ্ঠ করে তোলে, কিন্তু শেষ অবধি হয়তো এই রাবীন্দ্রিক

ঐশ্বর্যে মনোহর প্রকৃতি প্রায় শহুরে তরুণ কীটসের সৌন্দর্য-পিপাসায় বিধুর উপভোগের বাহারে জড় প্রকৃতির সমগোত্র, যদিচ অতীন্দ্রিয়—আনন্দরূপামৃতের নিহিত ঐক্যে, কিন্তু গ্রামীণ ওআর্ডসওআর্থের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সক্রিয় বাস্তবের প্রয়োজনীয় খেলায় ও কর্মে প্রত্যক্ষ সংলগ্নতায় নয়।

সেইজন্যই সে যুগে কোনো কোনো বিদ্বান যখন শিল্পসৃষ্টিবৃত্তিকে তুলনীয় বলেছিলেন খেলার সঙ্গে, লুডুস্-এর সঙ্গে তখন রবীন্দ্রনাথকে আপত্তি করতে হয়েছিল। তাঁর মতে "খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি মূলত একই।" কারণ খেলার মধ্যে দিয়ে "শিশুরা—কি ছেলে কি মেয়ে, নিজ নিজ ভাবে জীবনযাত্রার প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করে।" রবীন্দ্রজগতের বাসিন্দা না হলে কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, তাতে ক্ষতিটা কী? কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি রবীন্দ্রবিশ্বের ভূগর্ভস্থ তাত্ত্বিক সংকট, আমরা জানি যে প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি গত শতাব্দীতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রদেশে এক মফস্বলরাজধানীতে দুর্গত সমাজজীবনে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনে একটা অপরিহার্য হলেও জঘন্য বৃত্তি এবং সে বৃত্তির দৈনিক গ্লানি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল যখনই সম্ভব যেখান থেকে সম্ভব চলে যাওয়া আনন্দলোকে, রসলোকে, অনন্তে, অসীমে, জীবনের মর্ত্য স্থূল সংলগ্নতার বাইরে—"অন্য কোনোখানে"। এ তত্ত্বের বোধিক্রম আশ্রয় ছাড়া ভারতীয়, বাঙালী, উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথের আত্মরক্ষার আর কিছু ছায়া ছিল না।

এই তত্ত্বই যে চর্চার অবৈধ মাত্রাধিক্যে ন্যায্য উপসংহারে হয়ে ওঠে অমানুষিক, অপ্রকৃতিস্থ, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন; তাই তিনি তেওফিল গোতিয়ের মাদমোয়াসেল দ মোপ্যাঁর সৌন্দর্যবোধের চূড়ান্ত নৈয়ায়িকতায় ভোগবাদে বা হিডনিসমে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মতো সদাজাগ্রত পরম শুভবুদ্ধিতে, মানবিকতায় কখনোই

সম্ভব হত না ভিলিয়ে দ লিল্ আদাঁর সেই উক্তি : 'জীবনযাত্রার ব্যাপারটা, সে তো আমাদের হয়ে আমাদের চাকরবাকররা করবে—' যে উক্তিতে আয়ারলণ্ডের পরিপক্ক রোমান্টিক তরুণ ইএটস্ অত পুলকিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভালো, হুইজিঙ্গার খেলাতত্ত্ব বা লুডুস-মাধ্যমে মানবসভ্যতার বিকাশের ব্যাখ্যা যে গ্রহণীয় নয়, তার কারণ ভিন্ন। একপক্ষে এ ব্যাখ্যায় শিল্পসাহিত্যে তথা সভ্যতা নির্মাণের কর্মাবলীতে নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব প্রক্রিয়ার জটিলতা বাদ পড়ে যায়; অন্যপক্ষে এ তত্ত্বে আবার সেই বিচ্ছিন্নতা ঢুকে পড়ে আরেক চোরা দরজা দিয়ে, মানবজীবনের বা সভ্যতার ভ্যালুস বা পুরুষার্থ এতে নস্যাৎ হয়ে যায়, বাখ্ বেটোফোন গয়টে মান-এর জর্মানির সঙ্গে আডলফ্ হিটলরের রাইখের মৌলিক তফাত থাকে না। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি অবশ্য চৈতন্যের বিচ্ছিন্নতার জগৎ থেকেই আন্তরিক আরেক প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ স্বাভাবিক ছিল খাস-বিলাতে হয়তো আরো আগের থেকে সংবেদনশীল ব্যক্তির পক্ষে, কিন্তু বাংলায় স্বাভাবিক যখন একা একা সমস্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লড়ছিলেন, তখনই, উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের মুখোমুখি যুগে।

সে যুগের আরেকটি লেখায় বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে : "এক কথায় সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস, আনন্দের যোগ আমার ঘর।" কথাটা এখনও আমাদের দেশে—অনেক দেশেই সামাজিক কারণে সত্য, ঘরেই আমরা তবু খানিকটা স্বাধীন বোধ করি। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা, আপিস কলকারখানায় কাজের বিষয়ে চিন্তা যাঁরা করেন তাঁরা এখন বলেন যে শিক্ষায় বা জীবিকাকর্মে যতদিন না আপন ঘরের মতো বোধ, স্বাধীনতার বোধ, আনন্দের যোগ না আসছে, ততদিন শিক্ষা বা কর্ম কোনোটাই যথোচিত পূর্ণতা পায় না, এমন

কি শিক্ষা খঞ্জ থাকছে, বিদেশী থাকছে এবং কর্মের প্রয়োগশক্তির ও ফলের অংকে ঘাটতি হচ্ছে। তার জন্য অবশ্য ব্যাপক সামাজিক জীবনব্যবস্থাই মুখ্য ব্যাপার।

আধুনিক জানবিজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাকে অপরিহার্য না মেনে অন্তত আদর্শের দিক থেকে, জ্ঞানের তত্ত্ব হিসাবে সমাহার যে সম্ভব ও আশু প্রয়োজন তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা। একাকার করায় নয়, সংলগ্নতাতেই এই সমাহারের চেষ্টা সম্ভব; মানবসভ্যতার বর্তমান ও আসন্নসম্ভব পর্যায়ে, অন্তত জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব হয়েছে জীবনের দ্বন্দ্বময় বহিরঙ্গ বিচ্ছিন্ন রূপ থেকে মানবসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরাকরণের স্তরে উন্নয়ন। পণ্যবিপ্লবের যুগ আজ নিজের স্ববিরোধ-চঞ্চল গতিতে পৌঁছেছে আরেক যুগের মুখে, জাতিস্বার্থ পৌঁছেছে বিশ্বমানবিক স্বার্থের সংহতি স্তরে, শ্রেণীবিভাগ চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্বের নিয়মে শ্রেণী-বিলোপের সমাহিত সমাজের অন্য স্তরের বাদীপ্রতিবাদী বৈচিত্র্যের সম্ভাবনায়। ফলে আমাদের মনের বিচ্ছিন্নতার বোধ আজকাল অন্তর্দর্শী, আত্মসচেতনতায় তীব্র, হয়তো তির্যক, হয়তো ব্যঙ্গময়ভাবে গম্ভীর, চমকপ্রদভাবে বিরাগঅনুরাগে আন্দোলিত, দ্ব্যর্থময়। তাই আজ এ মানসে উইট ও আয়রনি আবার স্বাভাবিক, গভীর ও হঠাৎ-ধাক্কাদেওয়া লঘুতা একই তালে চলে। গদ্যধর্মের পূর্ণ ব্যাখ্যার চেয়ে তাই কাব্যধর্মী ইঙ্গিতময়তায়, ব্যঞ্জনায় আজ অভিজ্ঞতার রূপায়ণ। তাই রূপকে নয়, প্রতীকে আজ তৃপ্তি। সাহিত্যে তাই আইডিওলজি চায় আইডিওলজির রূপান্তর। সাহিত্য-উপভোগে তাই আজ যেমন পণ্ডিতম্মন্য ডক্টরিং-কম্পাউণ্ডিং মার্কা অধিকাংশ ব্যাখ্যানে মনে হয় এহ বাহ্য, তেমনি নিছক মরমিয়া ব্যাখ্যার পরোক্ষতাও মনে হয় অবান্তর। অন্তত অসম্পূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কয়েকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্মরণে আনলে কথাটা স্পষ্ট হবে। প্রথম উদাহরণ ধরুন:

"বিদ্যাপতি লিখেছেন—

যব গোধূলিসময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলিবেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে, আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার করতে পারিনেঁ। বস্তুত, "মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ছন্দে-বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা-সংযোগ যে একটি বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে, সেইটিই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূলবিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।" তথ্য ও সত্য—'সাহিত্যের পথে'।

দেশজ ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বরগুপ্ত নিশ্চয়ই অবাক হতেন, বিষয়টি প্রধান বস্তু নয়, তবে কি প্রধান বস্তু ? ছন্দবন্ধ বাক্যবিন্যাস উপমা-সংযোগ তাহলে কি করে আসল জিনিসটি তৈরি করবে ? রবীন্দ্রনাথের সারস্বত কাব্যতত্ত্বে অবশ্যই বহিরঙ্গ যান্ত্রিকভাবে অভ্যাসিকভাবে প্রাধান্য পায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকাশ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রয়োজনের রূপ নয়, বিশুদ্ধ আনন্দ-রূপকে ব্যক্ত করা। কারণ তাঁর তত্ত্বজগতে সত্য ও তথ্য অসংলগ্ন, বিরোধী ; তাই আনন্দরূপকে ব্যক্ত করার প্রয়োজনও যে একপ্রকার প্রয়োজন, সে তর্ক তোলা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা আনন্দদায়ক রচনা, অন্তত আমার মতো লোকের কাছে, যে এই রাবীন্দ্রিক হাওয়াতেই প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালের যুবক কেউ যদি পরুষ প্রশ্ন করে : ধনিকে কি রকম বালিকা ভাবব ? কত অল্পবয়েসী সে বালা ? সংসারের পশ্চাদ্‌ভূমিতে তাকে বসালে কবিত্বের ক্ষতিই বা হবে কেন ? বরং তুলনার নিহিত গুণে কি তাতে

তার বর্ণনাটা আরো তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনায় ঘন হয়ে ওঠে না? সে যে ঘরেই যাচ্ছে, তারই বা স্থিরতা কোথায়? ইভর রিচার্ডসের মেজাজে সে প্রশ্ন করবেঃ ছন্দবন্ধ ইত্যাদি সবই ঠিক কথা, কিন্তু বাক্য-বিন্যাসের সবচেয়ে বড় আবেদন কি এ ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলা বা মৈথিলী বাংলার আপতিক বালভাষিত আধো-আধোত্বে বা lisp-এর জন্য ঘটছে না, যেমন ঘটে চসরে? অধিকন্তু ছবির জন্যও কি লাইন তিনটি উপভোগকে গভীর করে না? গোধূলির ভাস্বরাভ অন্ধকার বাইরের বড় আকাশে, তার মধ্যে মন্দির, মন্দিরের ভিতরে আরেক অন্ধকার থেকে বেরোল গোরোচনা গৌরী মেয়ে, যেন ঘনায়মান মেঘের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের দ্রুত রেখা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

সমালোচনা সাহিত্যে সৃষ্টিশীল রচনারই গরজে যুগে যুগে ঝোঁক পালটায়, তাই নবাগতের আপাত উদ্ধত জিজ্ঞাসার ঔদ্ধত্যটুকু ক্ষমা করে আমাদেরও আপেক্ষিকভাবে জিজ্ঞাসু হতে হয়। ইংরেজি সাহিত্যে যে তিনজন সমালোচক অন্তর্দৃষ্টির মনীষায় শ্রেষ্ঠ, তাঁদের একজন অর্থাৎ ম্যাথ্যু আর্নলড-কেও এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে চসরের নাম এসে পড়েছে। আর্নলড 'কাব্য পাঠের সাধনা' নামক তাঁর অসামান্য প্রবন্ধে চসরের 'দি প্রিওরেসেস টালে'-র একটি স্তবক উদ্‌ধৃত করেছেন। আর্নলড যা বলছেন, তা হচ্ছে মোটামুটি এই ঃ

"My throte is cut unto my nekke-boon
Seyde this child, and as by way of kinde
I sholde have deyd, ye, longe tyme agoon. ইত্যাদি
(ll. 1839-41)

ওআর্ডসওআর্থ কাহিনীটি একালের ভাষায় পুনর্লিখন করেছেন এবং পদ্যের মোহিনী মায়া যে কী পেলব ও দ্রুতবিলীয়মান তা দেখা

যাবে চসরীয় স্তবকের তিনটি লাইন মাত্রের পর নিচের তিনটি লাইন একবার পড়লেই :

> My throat is cut unto the bone, I trow,
> Said this young child, and by the law of kind
> I should have died, yea, many hours ago.

বাস্, মোহিনীমায়া নিরুদ্দেশ। অনেক সময়ে বলা হয় যে চসরের পদ্যের তারল্য এবং মহামানবতা নির্ভর করত তদানীন্তন ভাষার শিথিল ব্যবহারের উপরে, যা আজকাল অসম্ভব, নির্ভর করত একটা স্বেচ্ছাচারের উপরে, যার সুযোগ বর্নস্-ও ভোগ করেছিলেন neck bird প্রভৃতি শব্দকে দুটি সিলেবলস বানিয়ে 'e' যোগ করে, আর cause-এর মতো শব্দকে দ্বি-সিলেবিক্ মিল হিসাবে ব্যবহার করে ঐ মূক 'e'-টাকে সরব করে তুলে। সন্দেহ নেই যে চসরের তরল প্রবাহ নিশ্চয়ই ঐ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতায় যুক্ত এবং চমৎকার সার্থক ভাবেই ; কিন্তু প্রথমটি যে নির্ভর করছে দ্বিতীয়টির উপরে একথা ভাবা ঠিক হবে না, কারণ তা নির্ভর করছে তাঁর শক্তিমত্তার উপরে।"

শক্তিমত্তা! এ রহস্যময় বস্তুটির নির্বিশেষ উল্লেখে আর্নলডের মতো মহাশয় সমালোচক ও অন্তরঙ্গ কবি ক্ষান্ত হতে পারেন যুগোচিত তাঁর প্রয়োজনে। কিন্তু, ধরা যাক, এজরা পাউণ্ড এই সমালোচনার সূত্রপাত করলে আমরা কি পেতুম? পেতুম বিশেষের প্রতি আরো মনোযোগ, যেমন পেয়েছিলুম ম্যাডক্স্ ফোর্ডের dim lands of peace-এর সমালোচনায় : lands of peace আবার dim কেন? lands কেন dim? নাকি peace হল dim? ইত্যাদি। নিশ্চয়ই ইংরেজি ভাষার তৎকালীন তারল্য ও অনির্দিষ্ট উচ্চারণ ব্যবহারের সুযোগ চসরের ছিল এবং ছিল ঐ ট্যালেন্টও, শক্তিমত্তাও। অধিকন্তু তাঁর লাইনকটিতে রয়েছে যথাযথ ও

মিতবাক স্পষ্টতা। ওআর্ডসওআর্থ স্বয়ং মহাকবি কিন্তু নির্বিশেষে ও বহুভাষিতায় ছিল তাঁদের কালের ঝোঁক। তাই "অনটু মী নেকে-বোন" হয়ে গেল "অনটু দি বোন্"—যে হাড় হাতেরও হতে পারে পায়েরও হতে পারে, ঘাড়ের না হলেও। তারপরে গরিব চসরকে তিনি দান করলেন অচল পয়সা "আই ট্রো"। আর "দিস্ চিল্ড্"-এ সন্তুষ্ট না থেকে যোগ করলেন নিষ্প্রয়োজন "ইআং"—অর্থাৎ ছেলে-মানুষ বা তরুণ শিশু! "ওআয়্" পালটে দিলেন আদালতগন্ধী "ল"-তে এবং সময়ের অনন্ত দৈর্ঘ্যের ব্যথাময় বোধটাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে নিরবধি, আমরণ "লঙ্গ্ টীম্" কেটে বসালেন ঘড়িওয়ালা নির্দিষ্ট "মেনি আওআরস এগো"!

রবীন্দ্রনাথ ঐ মূল্যবান প্রবন্ধেই তথ্য ও সত্যের বিতর্কে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন কীট্সের সেই সুপরিচিত গ্রীসীয় অর্নের উপরে ওডটির বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথ দেখেন ঐ পূজাপাত্র বা ভস্মাধারের সৌন্দর্য আসলে অখণ্ড একের সৌন্দর্য-মূর্তি, "কেন না অখণ্ড একের মূর্তি যে আকারে থাক না অসীমকেই প্রকাশ করে, এই জন্যই সে অনির্বচনীয়।" তাই তিনি কীটসের দুটি লাইন তুলে অনুবাদ ও ভাষ্যও করে দেন :

"Thou silent form, dost tease us out of thought

As doth eternity—

হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম।"

উল্লেখযোগ্য ঐ অসীম শব্দটি, কীটসের অনন্তকাল বা কাল-সন্ততির জাত পালটে গেছে দেশকালের উর্ধ্বে অনির্বচনীয়ে, উধাও অসীমে—হে নীরব রূপ, তুমি আমাদের নিয়ে যাও চিন্তার আঁজি থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে যেমন নিয়ে যায় চিরন্তন কাল।

এই প্রবন্ধে, বহু প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ যে অভ্রান্ত কবিত্বে উদ্ধৃতিগুলি

স্মরণ করেন, তাতে নব্য পাঠককেও অবাক হতে হয় এবং তার যে ব্যাখ্যা লেখেন, সেও কবির আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ভাষায়। যথা :

"জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাঁথার আছে, রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। আর চোখ যদি ডুবেই যায়, তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বনে কোন্ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কে কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে।"

চমৎকার সরস ব্যাখ্যা, রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় মুখের কথা যেন শোনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মুখের কথা যে হতভাগ্য উত্তরপুরুষ শোনে নি, সে প্রশ্ন করতে পারে: এই সরল শুদ্ধ, কবিতায় দুর্গ কোথায়? এতবড় ছলবল কৌশলের লড়াইটা হল কই? রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির যাত্রা যে সংগ্রামেই হল শুরু, সে কথা ভুলে গিয়ে সে হয়তো ভাববে: রবীন্দ্রনাথ কেন এখানে তথ্যের দুর্গের জয়-কৌশলে থামলেন? কেন দুটি ছবির ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের বৈপরীত্য-যোজনের আবেদনটা উল্লেখ করলেন না? রূপ ও যৌবন, আঁখি ও মন, পাথার ও বন, রূপের পাথারে আঁখি, যৌবনের বনে মন—ঐন্দ্রিয়িক প্রতিমাগুলির বৈপরীত্যে ও প্রতিবিন্যাসেই—জকস্‌টাপোজিশনেই এখানে প্রেমের আকাঙ্ক্ষার কবিত্বে তীব্রতা আসছে, তাতেই তথ্য একাকার অনন্তাধৃত সত্যে, তাতেই কবিতার সত্য হয়ে উঠছে অনির্বচনীয় তথ্য, রসের অসীম অভিজ্ঞতার সত্য-তথ্যের দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ বাক্যরূপ।

এতক্ষণ ধরে ধৈর্যচ্যুতি করছি এই কথাটাই আপনাদের সামনে বুঝতে চেয়ে, যে বিংশ শতাব্দীর যৌবনলাভের সঙ্গে এই সংযুক্ত বিন্যাস বা দ্বন্দ্বময় অলঙ্কারপ্রয়োগের কবিত্বময়তা সজ্ঞান স্বীকৃতি পেল। এই প্রবণতাতে আর সত্য কথার রূপকের মধ্যে অন্বিষ্ট থাকে না পরাজিত অথবা অপরাজিত তথ্যের কবিত্বরূপ, অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে শুদ্ধতর, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, অর্থাৎ সংগ্রামোত্তর প্রতীকের মধ্যে দিয়ে কাব্যিক অভিজ্ঞতা বা তথ্য তথা সত্য বিষয়ে অভিন্ন কবিত্বেরই স্বায়ত্তশাসিত, প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ আবেদন, তার নাম যাই দেওয়া হোক, অসীম বা অনির্বচনীয়। সেই জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধৃত পদের তৎকালীন ব্যাখ্যার সরলার্থ সৌন্দর্য সত্ত্বেও একালে হয়তো লাগে উইটের বা মননবৈদগ্ধ্যের মিশ্র আবেদনের আভাস—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।

যদিচ এর গদ্যব্যাখ্যানে প্রেমের আরতির মধ্যে রূপমন্ত্রের মতো এক দুই গণনার কাব্যিক চমকের ধার ক্ষীয়মাণ—"এক দুয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু রসসত্যের ক্ষেত্রে যে প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক দুয়ের বালাই নেই নামতার দৌরাত্ম্য নেই।"—রবীন্দ্রনাথের এ কথা মনে হতে পারে অবান্তর। ঐ ফর্দগণনার প্রায় কৌতুকময় অলঙ্কারই তো প্রেমের আরতির সহাস অথচ গভীরতর ব্যঞ্জনা আসছে, এক-দুয়ের অঙ্কে নয়, রূপে গুণে রসে প্রেমে আরো জটিল এক ইকোয়েশনে, যেমন আসে জন ডনের তীব্র প্রেমের কবিতায় কম্পাসের উপমায় বা স্বর্ণমুদ্রার উপরে ছাপের প্রয়োগে।

এরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বে ইস্কিলাসের পরেই, বড় জোর সোফোক্লিসের পরে আর ট্রাজেডি খাঁটি রইল না, এ কথা আমাদের

এরিস্টটেলীয় কিরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বাস করতেন। দান্তের কাব্যের মানদণ্ডে শেক্সপিঅরকে কবিতার পথকর্তা মহাজন বলা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তায় পাউণ্ড নিশ্চিত এবং আরেক চিন্তায় এলিঅটও যেন দোমনা হয়ে পড়েন তাঁর দান্তেবাদী ভিন্ন বিচারে। আবার ইওরোপীয় মানসের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে গত যুদ্ধের মেজাজে এলিঅটের ইংরেজ-মার্কিন কার্পণ্যে ব্যথিত হন তাঁর অনুবাদক গুণমুগ্ধ মহাপণ্ডিত কুরটিউস্ সাহেব। কিন্তু এরিস্টটলকে দুনিয়ার "জ্ঞানী মহাজনদের আদি গুরু" মেনেও এবং ইস্কিলাস সোফোক্লিসের নাটকের বিচার বিবেচনায় তাঁর অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক সমালোচনার মুগ্ধ ছাত্র থেকেও তো আমরা দীর্ঘকাল ধরে বহু ভিন্ন ধরনের নাটক উপভোগ করি, যেমন আমরা দান্তের মহাকবিত্বের 'স্বর্গমর্ত্য-নরকে' আলোড়িত হই, আবার উদ্দাম শেক্সপিঅরের নাট্য উন্মাদনায় আনন্দ পাই তাঁর কবিত্বের বিস্তারে ও উচ্চাবচ তীব্রতায়। আবার পাই রাসীনের অভিজাত কিন্তু আবেগকম্প্র নাট্যকাব্যে। তাই আমাদের স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমাদের মহাকবি তাঁর মতামতে তো বটেই, এমন কি বিরাট সাহিত্যকীর্তিতেও তাঁর দেশকালে বাধ্যতই নির্দিষ্ট ছিলেন। বিশ্ববিচারে আমাদের গৌরব হচ্ছে তিনি কিভাবে এবং কতখানি ঐ নির্দিষ্টতাকে ক্রমান্বয়ে সংকট ও উত্তরণের চৈতন্যময়তায় ঐশ্বর্যবিস্তারে অতিক্রম করেছিলেন। তাই সহজেই মেনে নিতে পারি যদি কেউ বলেন যে রবীন্দ্রনাথ জটিল আধুনিক জীবনের, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্যের জগতের তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময়তার নির্ভীক অন্তর্মুখিতা তথা বেশভূষাহীন দুঃসাহসিক বহির্মুখিতা পরিগ্রহণে একটা অভ্যাসিক বাধা বোধ করতেন। এবং তাই আধুনিক মননের লঘুগুরু, চিন্তা ও আবেগে উভবলী, দ্ব্যর্থময় আত্মসচেতনতার তীক্ষ্ণ ভাবভঙ্গীর তির্যক যাথার্থ্যও সম্পূর্ণ পছন্দ করতে পারেন নি।

সেইজন্যই তাঁর কাব্যেও প্রতীকোৎসারী ধ্যান শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে রূপকে ব্যক্ত ধারণা। তাই "উর্বশী" কবিতাতে প্রতীকমূর্তি-গঠনের শেষটায়, যেন পাছে পাঠকেরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ভুল বুঝে বসে, তাই কবি স্বয়ং প্রতীকটিকে দেশে কালে নিরাপদ নিশ্চয়তায় বসিয়ে দিয়ে বলেন : কী প্রলাপ কহে কবি! কীটসের নাইটিংগেল ওডের আলোচনায় নিজেই একবার আপত্তি জানান শেষ পঙক্তিকটিতে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বিষয়ে। যদিচ "দুঃসময়" নামে ইন্দ্রজালময় কবিতাতেও অন্তস্তবকে কুহক বিগলিত হয়ে যায় প্রায় একই কারণে। 'উৎসর্গ' বইটির অনেক কবিতাই আমাদের মোহিত করে ; ধরুন, তেইশ নম্বর কবিতাটি :

১। শূন্য ছিল মন,
নানা-কোলাহলে-ঢাকা নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা-জনতায়-ফাঁকা কর্মে-অচেতন
শূন্য ছিল মন।

২। জানি না কখন এল নূপুরবিহীন নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণরেখা কী লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা তাও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

৩। হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো কোন স্বর্গ হতে
চাঁদখানি লয়ে হেসে শুক্লসন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে!
বুঝি সে আপনি মেশে আপন আলোতে।
এল কোথা হতে!

৪। অকস্মাৎ বিকশিত পুষ্পের পুলকে তুলিলাম আঁখি।

আর কেহ কোথা নাই　　　　　　সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই　　　　　　মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

৫। রাজহংস এসেছিল কোন যুগান্তরে　　শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে　　　　　　স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জবিতানে—
কাঁর কথা হেনকালে　　　　　　কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

৬। জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো　　　　আকাশ বাহিয়া এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের　　　　　　লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন্ উৎসুকের　　　　　　মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে!

৭। দুইখানি শুভ্র ডানা　ঘেরিল আমারে　সর্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির　　　　　　নিস্পন্দ রহিল স্থির
কথাটি না কয়ে।
কোন পদ্মবনানীর　　　　　　কোমলতা লয়ে
পশিল হৃদয়ে!

৮। আর কিছু বুঝি নাই,　　শুধু বুঝিলাম　　আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম,　জানি নাই তার নাম　লিপি যার লেখা।
এই শুধু বুঝিলাম,　না পাইলে দেখা　রব আমি একা।

৯। ব্যর্থ হয়,　ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী,　এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন　হয়ে আছে অর্থহীন　এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ　করিছে বহন　ব্যর্থ এ জীবন।

১০। ওগো দূত দূরবাসী,　ওগো বাক্যহীন,　হে সৌম্য সুন্দর।
চাহি তার মুখ-পানে　ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে　কী দিব উত্তর!
অশ্রু আসে দুনয়ানে,　নির্বাক অন্তর,　হে সৌম্য সুন্দর!

যে মন্ত্রোচ্চারণের মোহজালে এই কবিতাটির বিষাদ-সৌন্দর্য কবি-সত্তার নির্বিশেষ বেদনা বরাবর মনকে আবিষ্ট করে, তা দশম স্তবকেও বোধহয় নিরুদ্দেশ হয় না। বস্তুত এ কবিতাতে যে সামগ্রিকতার রূপ তা সম্পূর্ণভাবে রাবীন্দ্রিক এবং অপরিবর্তনীয়। তৎসত্বেও তর্কের খাতিরে মালার্মেবিলাসী বন্ধুবান্ধব কেউ, যেন প্লেইআদ্ থেকে পারনাসীয় কবিতার ঐতিহ্য তাঁর মনের মাটিতে, বলতে পারেন্: রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে উৎপ্রেক্ষার ব্যঞ্জনার চেয়ে উপমার ব্যাখ্যানে প্রবণতা, তার নিদর্শন এই প্রেরণাসিদ্ধ কবিতাতেও। তিনি হয়তো সংহতির রূপান্তর চেষ্টায় চতুর্থ স্তবকের পরে পঞ্চমটি—অর্থাৎ দময়ন্তীর উল্লেখটি বাদ দিতে চাইবেন। আমার অভ্যস্ত ও লোভী মন আপত্তি করবে, দময়ন্তী ও রাজহংস আমাদের আবাল্যপ্রিয় উপাখ্যান ও চিত্র। ষষ্ঠ স্তবকটিও উচ্চারণ না করে তিনি হয়তো আবৃত্তি করেন সপ্তমটি, ফলে হয়তো দময়ন্তীর বিশিষ্ট রাজহংস হয়ে যাবে মানসসরোবরের মরাল, কিংবা লিডার গ্রীসীয় রাজহংসের ব্যঞ্জনাঢ্যতা। তারপরে তিনি মন্ত্রমোহজালে নিষ্ঠুর ছেদ টানবেন নবম স্তবকে। বলবেন যে কবিতায় সংহতির মিতব্যয়িতাই মুখ্য কথা এবং তাতে উপমাউপাখ্যানে লক্ষ্যভ্রষ্ট শৈথিল্য আসে, সুতরাং সুন্দর চিত্র বা রসের ইঙ্গিত উল্লেখ গৌণ সব কিছুই আত্মত্যাগের কাঠিন্যে ধ্যানের কৃচ্ছ্রসাধনে বর্জনীয়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতার মেজাজ রাবীন্দ্রিক অতিভাষী হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর কবিতা তর্কের জবাবে উদ্ধৃত করা যায়, যেখানে মালার্মেপন্থীও হাত দিতে পারবেন না, যেখানে সমগ্রভাবেই গুঞ্জরিত হবে "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র মতো কবিতা।

আধুনিক সমালোচনার এসব আপেক্ষিক ও জিজ্ঞাসামূলক কথা মেনে নেব; কিন্তু মনে রাখব যে রবীন্দ্রনাথই অনভ্যস্ত ও তাঁর পক্ষে স্বাধীন বলেই চিত্ররচনার স্রোতে তাঁর চৈতন্যকে

অবাধ ঐশ্বর্য দিয়েছেন, যার ফলে তাঁর চিত্র স্বাধীন চেতন-অবচেতনের সংলগ্নতায় মূর্তি পেয়েছে হুহাজার চিত্রপটে। আর ভুলতে দেব না যে দীর্ঘ সত্তরপঁচাত্তর বছরের আস্তিক্যের অভ্যস্ত আসন সত্ত্বেও এই কবি বিশ্বের কালান্তরে এবং নিজের চৈতন্যনাশা অসুস্থতার মধ্যে বিবিক্ত আত্মসচেতনতার সংকটের মৌলপ্রশ্নের মুখো-মুখি হয়েছিলেন এবং উত্তীর্ণ কৈবল্যে লিখেছিলেন বার্ধক্যেও নতুন আবিষ্কারের বিরল দ্বিধান্বিত ভাষায় ছন্দে বাংলার আধুনিকতম বেশ কিছু কবিতা—আধুনিকতম যদিচ সরলরেখায় উত্তরণশীল।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধটি লেখা যাকে বলে বৃদ্ধবয়সে, যদিও সে লেখা চলে তেজীয়ান্ ঘোড়ার চালে; লেখার মেজাজ ধারে অসাধারণ। "ব্যক্তিগত খুশির দৌড়"—এই তিনি সংজ্ঞা দেন সেকালের কাব্যে আধুনিকতার। কিন্তু নানা বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে নানা জটিলতা গোচরে আসায়, বিশ্বের সভ্যতায় মনন হয়ে উঠেছে আত্মসচেতন, তীব্রতায় সংকুচিত; দেশের বিদেশের ঐতিহ্যে সে নিজের মননের জাগ্রত ভরসা চায়; আত্মজিজ্ঞাসায় সে দীন, তাই সে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়ে ভয় পায় এবং সেই খুশির দৌড়ে তার আত্মসচেতন লজ্জা, এবং হয়তো লজ্জাবশতই সে সরাসরি গভীর স্বরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে সাহস পায় না আর আপনি হাসে তাই, তাই তার রুদ্ধবাক্ বক্রোক্তি বা ব্যঙ্গই। তাই সে মাথা হেঁট করে থাকে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের উক্তিতে: "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।" কারণ কবিচিত্তের অনুভূতির স্বরূপ ও পুরুষার্থ, তার উৎসের ও অস্তিত্বের মিশ্রতার বিষয়েই সে জিজ্ঞাসু, ইঙ্গমার্কিন পজিটিভিসমে বা প্রাগমাটিসমে সে সমাধান পায় না আবার শুধু তার ধর্মীয় প্রতিবাদেও পায় না—যদিচ সে ভাবতে পারে গির্জায়

আশ্রয় মিলবে অথবা আচারঅনুষ্ঠানে গুরুবাদে কিংবা পাউণ্ডের মতো ভাবতে পারে যে সুরাহা বুঝিবা তুর্গত ইটালির মুসোলিনির শক্তিবাদে। কিন্তু অনেকেই বোঝে যে এরকম প্রতিবাদে শেষ-অবধি সমাধান পাওয়া দুষ্কর, কারণ আধুনিক মননের যথার্থ ন্যায়-বিশ্বই অন্য। তারা জানে যে কবিচিত্তের অনুভূতি আর কবিতার অনুভূতি সমার্থক নাও হতে পারে, জানে যে কবিচিত্তের অনু-ভূতির মধ্যে তার নিজের প্রস্তুতি মতো কিছু কবিত্বের উপাদান যেমন থাকতে পারে বা নাও পারে, তেমনি আবার অনুভূতিটা আত্মা আর ভাষায় সুন্দর রূপটা শরীর অথবা প্রথমটা শরীর আর দ্বিতীয়টা পোশাক, এ যান্ত্রিক দ্বৈতবাদী কথাটাও তার কাছে দুর্বোধ লাগে।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ অধৈর্য বোধ করেন ইঙ্গমার্কিন কবিদের বিষয়ে। এমি লোয়েলের প্রসঙ্গটা আলোচনা করলে তাঁর বিরাগ ও অধৈর্যের চেহারা স্পষ্ট হতে পারে। এমি লোয়েল ইমেজিসম্ আন্দোলন ব্যতীত নিশ্চয়ই গৌণ কবি ; তাঁর সৌভাগ্য বলতে হবে, যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা রাগতভাবে করলেও অনুবাদ একটা করেছেন।

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিংবা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে রাখা মাথাঘষা মসলার মতো ঝাঁজ।

তোমার অতিকোমল স্বরের আমেজ আমার লাগে ভালো—
তোমার ঐ মিলে মিশে যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা, তোমার
পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝকঝকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে ॥

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন: "এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং করে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেক কালের যে মাধুরী, তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই", ইত্যাদি।

এমি লোয়েলের কাব্য খুব একটা গণ্যমান্য কিছু নয়, এমন কি ইঙ্গ-মার্কিন কাব্যে তাঁর আধুনিকতা মারিয়ান মূরের পাশে নিতান্ত নিরীহ সাবেকী সৌন্দর্যবিলাসী বলেই স্বীকার্য। কিন্তু মূলে কবিতাটি হালকা চালে বনেদী আমলের ঠাকুমা দিদিমার বিষয়ে কিছুটা স্নিগ্ধ কৌতুক কিছুটা মমতামিশ্রিত একটা উদাসকরা আকর্ষণের আমেজে, নস্টালজিয়ায় উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন স্পষ্ট, সেটাই হয়তো অনেকের কাছে মনে হবে চলতি শরৎমেঘের মতো কোমল এবং বরং একটু অস্পষ্ট কবিত্বে মণ্ডিত গদ্যকবিতা—প্রায় রাবীন্দ্রিক, প্রায় "লিপিকা"র মতো না হোক্ "পুনশ্চ" "শেষসপ্তক"-এর কথিকা-কবিতার মতো।

A Lady

You are beautiful and faded
Like an old opera tune
Played upon a harpsichord;

Or like the sunflooded silks
Of an eighteenth-century boudoir.
In your eyes
Smoulder the fallen roses of outlived minutes,
And the perfume of your soul
Is vague and suffusing
With the pungence of sealed spice-jars.
Your half-tones delight me,
And I grow mad with gazing
At your blent colours.

My vigour is a new-minted penny,
Which I cast at your feet.
Gather it up from the dust,
That its sparkle may amuse you.

তুমি সুন্দর আর বিশীর্ণকান্তি
যেন এক পুরোনো এক অপেরার সুর
হার্পসিকর্ডে বাজানো,
কিংবা যেন রৌদ্রের বানে ভাসা রেশ্‌মিনা
আঠারো শতকের অন্দর মজলিসঘরে।
তোমার চোখে
অনির্বাণ জ্বলছে জীবনোত্তর মুহূর্তগুলির ঝরা গোলাপ,
এবং তোমার মনপ্রাণের সৌরভ
অস্পষ্ট আর পরিব্যাপ্ত
ঢাকনি-বন্ধ মসল্লা-কলসির চড়া গন্ধে।
তোমার অর্ধস্বরগুলি আমায় পুলকিত করে,
আর আমি ক্ষেপে উঠি তাকিয়ে তাকিয়ে
তোমার মেলানোমেশানো রঙের বাহারে।
আমার সামর্থ্য টাঁকশাল থেকে সদ্য বেরোনো একটা পয়সা,

যা আমি তোমার পায়ে রাখলুম,
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার জলুসে তোমার মজা লাগতে পারে।

এমি লোয়েলের পাশে এজরা পাউণ্ড অনেক বেশি গণ্যমান্য সাহিত্যিক। তাঁর সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আপত্তি পাঠ ও অনুবাদের অলিগলিতে বিভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে এজরা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে একটি মেয়ে চলছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোট ছেলে, তালিদেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না, বলে উঠল, দেখ চেয়ে রে, কী সুন্দর!" এই ঘটনার তিন বছর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড় বড় কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল ব্রেসচিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেরা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, "স্থির হয়ে বোস্" তখন সে সেই মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, কী সুন্দর! কবি বলছেন, শুনে I was mildly abashed.—তারপরে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এই কবিতা ও এর সৌন্দর্যতত্ত্ব সংক্রান্ত সব কবিতাই বাতিল করে দেন। কিন্তু কবিতাটি নিতান্তই নিরপরাধ, এবং যেটুকু মজাদার চটক কবিতাটিতে আছে, তা চমকে যাবার মতো বা রাগ করবার মতো মারাত্মক কিছু নয়ঃ

The Study in Aesthetics

The very small children in patched clothing,
Being smitten with an unusual wisdom,
Stopped in their play, as she passed them
And cried up from their cobbles,
Guarda! Ahi, guarda! ch'e be'a!

But three years after this
I heard the young Dante, whose last last name
I do not know—
For there are, in Sirmione, twentyeight young Dantes
and thirty-four Catulli;
And there had been a great catch of sardines,
And his elders
Were packing them in the great wooden boxes
For the market is Braescia, and he
Leapt about, snatching at the bright fish
And getting in both of their ways;
And in vain they commanded him to *sta fermo!*
And when they would not let him arrange
The fish in the boxes
He stroked those which were already arranged,
Murmuring in his own satisfaction
The identical phrase:
Ch'e be'a!
And at this I was mildly abashed.

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত ইটালি শুনেছি তাজ্জব দেশ, বৈদগ্ধের ব্যাপ্তি সেখানে সমাজের নিচের তলাতেও হাওয়ার মতো নেমেছে, যার ফলে সিরমিওন-তে শুধু যে আটাশটি ধীবরশিশু দান্তে-নামধারী তা নয়, ও ভেনুস্তে সিরমিও-র কবি কাতুল্লুসই আছে চৌত্রিশটি বাচ্ছার নাম। এবং জেলে-গ্রামের একজন বাচ্ছার সৌন্দর্য-বিষয়ে এই নৈর্ব্যক্তিক নির্বিকার কিন্তু সরাসরি সাত্ত্বিক উত্তেজনায় সাহিত্যের পেশাদার কবির লজ্জা তো হতেই পরে—সৌন্দর্যবিলাসীর তামসিকতাতেই তো সৌন্দর্যবস্তুর জাতবিচার সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ রুষ্ট অবজ্ঞায় বলছেন : "সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও, একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না, কী সুন্দর!" বিষয়ীর আত্মময়তা তো নয়, নির্বিশেষ বিষয়ের উপরে মনোযোগ বা শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে হঠাৎ মানা কেন যে কঠিন, তা সবাই জানেন। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ জানেন ও বলেনও "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, বিশুদ্ধ আধুনিকতা কী তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।"—যা ঐ জেলের ছেলেটি দেখতে পেরেছিল। অবশ্য আধুনিক মনের তদ্‌গত দৃষ্টি বস্তুত বৈজ্ঞানিকের মতো, শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু মূলত পরীক্ষার, পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। হয়তো আধুনিক সাহিত্যিক বা অনেকেই এমনিতর একটা রবীন্দ্রোত্তরাধিকারী ধারণা নিয়েই লেখেন, কিন্তু তাঁদের সামাজিক জীবনের পরিবেশ বাদশাহী চীনের মহাকবি লি-পোর মরমিয়া নিসর্গশান্ত সংযত কবিত্ব থেকে ভিন্ন এবং রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বাধা এখানেই। আততির আভাসমাত্র থাকবে না, এমনি নির্বিরোধ কাব্যের রীতিতে তাঁর বাধা লাগে না, কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে বাস্তবকে তিনি দূরে রাখতে চান (আবার বাস্তব তাঁকে বার বার নানাভাবে জড়িতও করে), কারণ তাঁর তত্ত্বে ও বাস্তবে ছিল তাঁর প্রারম্ভিক সত্তার বিরোধ, বা শেষ অবধি সর্বগ্রাহী দ্বান্দ্বিক সমাধানে মেলে না।

অবশ্য তদ্‌গতভাবে বা বিষয়নিবিষ্টভাবে দেখার চেষ্টায় যে কয়েক জন সুপরিচিত কবি কমবেশি সিদ্ধিলাভ করেছেন, যথা ভালেরি, রিল্‌কে, হয়ত বা এলিঅট, এমন কি পাস্টেরনাকও, তাঁরা শেষ অবধি প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ বিষয়-তদ্‌গত থাকতে পারেন না। ভালেরির গাণিতিকোপম তদ্‌গত আসনই বা নৈর্ব্যক্তিক পের্সোনা-ই বোধ হয় সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কসরত, কিন্তু এঁরা প্রায়ই নিজেদের কবিসত্তাকে এথলিটের মতো প্রকাশ্যেই দমিত রাখেন। কাব্যদেবী

শেষ অবধি মহিলাই, তা সে তিনি শাড়িই পরুন বা ডিনারসজ্জা অথবা সার্কাসের আঁটসাঁট জাঙ্গিয়াকাঁচুলি! রিল্‌কের মধ্যেও বস্তুর বিষয়ে তদ্‌গত আত্মদানের মেজাজ মরমিয়া হয়ে যায়। পাস্টেরনাকের প্রাথমিক খুচরো লেখায় যাকে হয়তো মনে হয় বিষয়তদ্‌গত শুদ্ধির স্বভাব তাই দেখা যায় মূলত আত্মসর্বস্বতারই ছদ্মবেশ, ঐতিহাসিক বৃহৎ বাস্তবকে তিনি কবি সত্তার সমস্যায় মেলাতে পারেন নি। এ বিষয়ে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি না করে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর প্রামাণ্যজ্ঞানপ্রসূত মন্তব্য স্মরণ করি ঃ

"বোঝা যায় এঁই ধরণের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক লেখকের পক্ষে উৎকেন্দ্রিক হবার বাধা কম। ভাগ্যক্রমে রাশিয়ায় এঁর জন্ম, প্যারিসের গলিতে নয়; তাই সাইবেরিয়ার দিগন্তজোড়া টুন্‌ড্রা, জনসংঘের দোল এঁর পৃষ্ঠায় হঠাৎ অবতীর্ণ হয়। টলস্টয় টুর্গেনিভের ইনি সগোত্র তাও বোঝা যায়, কিন্তু কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত তিনি ভয়ার্ত; শুধু বহির্গত কারণে নয়, আত্মস্বভাবের বশে। কোথায় যেন দুই জগতের মিল ঘটে নি এই যুগশেষবিলাসীদের শিল্পে। যা উজ্জ্বল অথচ প্রাচীন, যা আগামী অথচ সূর্যসম্ভাবী তার সংগম যেন এঁরা চৈতন্যের সাধনায় জানেন নি।...দুঃসাধ্য জাতীয় অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়পারগামী উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনো গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না।...কেননা আসল প্রসঙ্গ মানবজীবনের সর্বতম সূক্ষ্মতম বোধকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"-তে ঐ দেশ সম্বন্ধে যে সকল স্পষ্টদর্শিতা আছে, সমগ্র আন্দোলনের একটি "বড়ো" দিক সম্বন্ধে জিভাগোর সেই দৃষ্টি নেই।...

"আবার ফিরে আসতে হয় অপ্রত্যাশিত চারিত্রিক ভগ্নতার প্রসঙ্গে। একদিকে ধার্মিক গোঁড়ামি অন্যদিকে জিভাগোর চরিত্র মানবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্‌ভ্রান্ত বা ক্লান্ত ঔদাসীন্যে ক্ষয়শীল। "মরালিটি"-র দরিদ্র আখ্যা নিয়ে তর্ক করব না, চিত্তধর্মের অভাব যেখানে মানবধর্মের প্রকাশে বাধা দিয়েছে সেখানে আপত্তি জানিয়ে রাখব। সেই আপত্তি শিল্পরুচির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

এলিঅট সাহেবের যে আত্মসংকোচ, তার পিছনের বর্জননীতি সত্ত্বেও তা তাঁর ভক্তের কাছে ঠিক এয়নি অবজ্ঞেয় নয়; এলিঅটের কবিতায় এবং কবিতার বিকাশধারায় পাওয়া যায় আধুনিক বিশ্বের অস্থির হওয়ায় ব্যক্তিসত্তার যন্ত্রণা ও অসম্পূর্ণ হলেও আন্তরিক নিরাকরণ প্রয়াসের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রথম বয়সের কবিতা কয়টিতে দাঁড়াবার একটা ছোট কিন্তু সভ্য জায়গা তিনি খুঁজেছেন, বিদগ্ধ সমালোচকমনের ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণায় বোঝবার চেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথের ছিল ইংরেজির সঙ্গে সেই আত্মীয়তা, ইঙ্গ-মার্কিন জীবনের সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতা, যাতে তাঁর পক্ষে এই কবিতার ভঙ্গী অপরিচিত থাকার কথা নয়, কিন্তু তাঁর মন শিঁটিয়ে ছিল ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাঁর ভাববাদী তাত্ত্বিকতার বিধিনিষেধে। না হলে কী করে তিনি লিখলেন নিম্নোক্ত উপভোগ্য কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট সমালোচনাটুকু:

"এই প্রসঙ্গে এলিঅটের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই: বুড়ি মারা গেল—সে বড় ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নামিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড় খানসামা ডিনারটেবিলের ধারে বসে বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

"ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তাহলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা পড়বার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে, কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্ট এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তাহলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি, কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য তাহলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে।"

এ আক্রমণ আমাদের মজার লাগলেও বোধ হয় অযথা নিষ্ঠুর

কারণ কবিতাটির অপরাধ অত গুরুতর নয়। প্রথমত হালকা কবিতা, ছোট, ব্যঙ্গময়। পিছনের ছবিটার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ অধীরভাবে বাদ দিয়েছেন: নীতিবাগীশ অবস্থাপন্ন নবইংলণ্ডের চিরকুমারী মাসি বা পিসির বাড়ি, তিনি দেহরক্ষা করলেন; খুঁটিনাটি কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে তাঁর সচ্ছল অনূঢ়া দাপটের একটি পোর্ট্রেট এবং তাঁর সতর্ক সযত্ন জীবনযাত্রার প্রায় হাস্যকর করুণ অর্থহীনতা:

Miss Helen Slingsby was my *maiden* aunt,
And lived in a small *house* near a *fashionable* square,
Cared for by servants to the number of four.
Now when she died there was *silence in heaven*
And silence at *her end of the street.*
The shutters were drawn and the undertaker *wiped*
his feet
He was aware that this sort of thing had occurred before.
The dogs were *handsomely* provided for,
But shortly afterwards *the parrot died too.*
The *Dresden clock* continued ticking on the mantelpiece,
And the footman sat *upon the dining table,*
Holding the second housemaid on his knees—
Who had been always so careful while her mistress lived.

মিস হেলেন স্লিংসবি ছিলেন আমার চিরকুমারী মাসিমা
এবং থাকতেন ফ্যাশনেবল স্কোয়্যারের কাছে একটি বাড়িতে,
(অর্থাৎ ফ্লাটে নয়)
তাঁর তত্ত্বাবধান করত সংখ্যায় চারজন দাসদাসী।
তারপরে যেই তিনি মারা গেলেন স্বর্গে নামল নীরবতা
এবং নীরবতা নামল তাঁর দিকের রাস্তাটায়।
খড়খড়িগুলো নিচু করা হল আর কাফনকর তার জুতো মুছে ঢুকল—
তার জানা ছিল যে এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে।
কুকুরগুলোর জন্য বিলিব্যবস্থা হয়েছিল দরাজভাবে,
কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে কাকাতুয়াটা মরেই গেল।

ড্রেসডেন ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলল ম্যাণ্টেলপীসে
এবং বেয়ারাটা খাবার টেবিলের উপরে চেপে বসল
হাঁটুর উপরে টেনে তুলে সংসারের হ্রস্বর দাসীটিকে—
কর্ত্রীর জীবদ্দশায় সে ছিল সর্বদাই কত সাবধান ॥

রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তর ও টীকা এবং মূলের তফাতটা স্পষ্ট। অথবা ধরা যাক এডউইন আর্লিংটন্ রবিনসনের ছোট কবিতাটি :

Whenever Richard Cory went downtown,
We people on the pavement looked at him:
He was a gentleman from head to crown,
Clean-favoured and imperially slim.

And he was always quietly arrayed,
And he was always human when he talked;
But still he fluttered pulses when he said,
'Good morning,' and he glittered when he walked.

And he was rich—yes, richer than a king,
And admirably schooled in every grace:
In fine, we thought he was everything
To make us wish that we were in his place.

So on we worked, and waited for the light,
And went without the meat, and cursed the bread;
And Richard Cory, one calm summer night
Went home, and put a bullet through his head.

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না—প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব সাধনা বলে বাহাদুরি করতে হবে। একজন কবি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করেছেন—

"রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।

ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,
ছিপ্‌ছিপে, যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন, 'গুড মর্নিং', আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বালবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোড়ি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ বলে সুন্দর বলে প্রতীয়মান, তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী বলে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে উপবাসী।" ইত্যাদি। রবিনসন খুব একটা মহাকবি হয়তো নয়, কবিতাটি সরল সহজ ছোট, কিন্তু ধনীকে আক্রমণ অথবা অঘোরপন্থীর সাধনা বললে গরিব লোকদের নিজেদের ও ধনীরও বিষয়ে ব্যঙ্গাভাস ও অসহায় করুণায় দ্ব্যর্থময় কবিতাটির প্রতি অযথা সম্মান ও অন্যায় সমালোচনা হয় নাকি? অবশ্য আয়রনির উভবলী দ্বিধা বা ব্যাজোক্তির তীব্রতা রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস থেকে ভিন্ন। এবং এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পাঠস্মৃতি থেকেই উদ্‌ধৃত

করেছিলেন। মূলে কবিতাটির অর্থ অত কিছু আপত্তিকর নয়ঃ

যখনই রিচার্ড কোরি শহরের মধ্যে নেমে আসতেন,
রাস্তার শানের উপরে আমরা মানুষগুলি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতুম :
মহাশয় লোক ছিলেন বটে পা থেকে মাথা অবধি,
পরিচ্ছন্ন মুখ, আর গড়নটা বাদশাহী চালের ছিমছাম্।
আর তিনি সাজপোশাক পরতেন সর্বদাই চাপাভাবে
এবং কথা যখন বলতেন তখন মনে হত তিনি নিছক এক মানুষ,
তবুও তিনি লোকের নাড়ী চঞ্চল করে তুলতেন, যখনই বলতেন,
"সুপ্রভাত", আর যখনই তিনি হেঁটে যেতেন তখন ঝক্‌মক্ করতেন।
এবং তিনি ধনবান, হ্যাঁ রাজারাজড়ার চেয়েও ধনী,
আর সবরকম ভব্যতায় চমৎকার ছিল তাঁর শিক্ষাদীক্ষা :
এক কথায় বলতে গেলে, আমরা ভাবতুম তিনি সব কিছুই,
যার জন্য আমাদের সাধ হত আমরা যদি তাঁর জায়গায় থাকতুম।
তাই এইভাবে আমরা খেটে যেতুম আর অপেক্ষা করতুম আলোর জন্য,
আর মাংস খাওয়াটা বাদই দিতুম আর পাঁউরুটিটাকে গাল পাড়তুম ;
আর রিচার্ড কোরি, বসন্তের এক শান্ত রাতে
বাড়ি ফিয়ে গেলেন আর নিজের মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন গুলি ॥

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ স্মৃতির অনিশ্চয়তা ছাড়াও বিতৃষ্ণাবশতও অনেকটা বেঁকেচুরে গেছে। এলিঅট বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মত পরিবর্তন করেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগের রোগোত্তর কবিতাগুলিতে যে সত্তার আলোআঁধারি জগতের প্রশ্নময় হাওয়া ওঠে, তাই যেন বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘুরে ফিরে এলিঅটের ফোর কোআর্টেটস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যের বিশুদ্ধ বিষয়। আধুনিক বিশ্ব তার জ্ঞানবিজ্ঞান যুদ্ধবিগ্রহ রাজনীতি ধর্মীয়তা অনেক কিছু নিয়ে এই কবিতার সভ্য সূক্ষ্ম প্রস্তুতিভূমি। এলিঅটের মতামত বা তত্ত্ব ইংরেজিতে

একালের শ্রেষ্ঠ কবিতাটিতে উঁকিঝুঁকি দেয় বটে, এবং সে তত্ত্ব হয়তো তত্ত্ব হিসাবে আমাদের মানবতার কাছে অলীক, অবাস্তব, অগ্রাহ্য। কিন্তু সেইখানেই কবির জিত, এলিঅটের কাব্য তাঁর মতামতের ঘটককে উহ্য করে দেয় কাব্যের আবেগে, ও প্রতিভান্বিত প্রকাশের অপূর্ব মিলনে। কার্লস উইলিয়ামসের মতো ভাষা ব্যবহার না করলেও আমরা অনেকে ভাবতে পারি যে এলিঅট হচ্ছেন an archbishop of procurers to a lecherous antiquity. ইংরেজ ও ইংরেজমন্য কিছু মার্কিন মনে ছাড়া এলিঅটের তত্ত্ব অবান্তর, যদিচ তাত্ত্বিকতার উৎসের আধুনিক মানবিকতা এবং আধুনিক মননের যন্ত্রণার আবেদন উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে দেশকালের সীমানা ডিঙিয়ে।

ব্যক্তিসত্তার সমস্যা সীমায়িত, প্রায় স্বার্থগণ্ডীবদ্ধ হলেও অধিকাংশ পশ্চিম ইওরোপীয় বা মার্কিন শিল্পী সাহিত্যিককে আধুনিক মননের আততিতে সজাগ করে, যেমন মনে হয় স্বস্তি ও স্বাধীনতা উত্তরোত্তর ব্যাপক হওয়ায় সোভিয়েট শিল্পী সাহিত্যিকদের রচনাতেও আত্ম-সচেতন জিজ্ঞাসা বৃদ্ধিলাভ করছে। কিন্তু সংকটবোধ যেখানে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিপ্রধান, সেখানে সংকট নামে ছায়ামূর্তিদের সঙ্গে, হয়তো বা মঞ্চে অবতীর্ণ গণ্ডারদের সঙ্গে! অধিকন্তু, ঐ অবাস্তব ভাববাদে, ঐ ধর্মীয়তায় বা ধর্মবিরোধিতায় রাবীন্দ্রিক ভাববাদের বিশ্বজনীনতাও নেই।

যে ঐক্যবোধের ধর্মে মানবিকতায় ও সভ্যতায় জীবন সৃষ্টিময় হয়ে ওঠে, সেই পশ্চিমোত্তর সাম্রাজ্যহীন বিশ্বজনীন আশ্বাস তাই এঁদের কাব্যে নাটকে উপন্যাসে চিত্রে ভাস্কর্যে দুর্লভ। অর্থাৎ মানবসভ্যতার আধুনিক বিবর্তনের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি এঁরা হৃদয়ংগম করতে শেষ পর্যন্ত অক্ষম থেকে গেলেন। অর্থাৎ অহম্-সংকট-দীর্ণ মানস উপনীত হল না অবৈকল্যসংকটের পর্যায়ের পরিণতিতে যা হয়েছিল রবীন্দ্রমানস।

(৩)

এরিকসনকে আবার উদ্‌ধৃত করে আমাদের আলোচনার চেষ্টার শেষ পর্বে আসা যাক। তিনি মনের আধিনিবারণের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"কিন্তু আমরা ক্লিনিসিআনরা সম্প্রতি শিখেছি যে ইতিহাস থেকে আমরা রোগীর কেসের ইতিহাস বাদ দিতে পারি না, ঠিক তেমনি ভাবে, যেমন আমাদের মনে হয় যে যখন ইতিহাসকারেরা যে সমস্ত জীবনেতিহাস ঐতিহাসিক ঘটনাটিতে জড়িত তার থেকে ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায়সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, তখন তাঁরা অনেকগুলি জীবন্ত ঐতিহাসিক সমস্যাও বাদ দিয়ে ফেলেন তাঁদের বিবেচনার থেকে।

"মনোবিকলনশাস্ত্রে ও চর্চায় বোধহয় সবচেয়ে অবহেলিত প্রশ্ন হচ্ছে কর্মজীবনের প্রশ্ন ঃ যেন আইডিয়ার ইতিহাসের ডায়ালেকটিক মনোবৈজ্ঞানিকের চিন্তায় এমন একটি ন্যায়ব্যবস্থা তৈরী করেছে, যাতে ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী কিভাবে যে জীবিকা নির্বাহ করে তা সে কিছুতেই জানতে চাইবে না, যেমন আবার মার্ক্সিসম্ মানে না মনঃসমীক্ষণের সার্থকতা এবং মানুষের (এরিকসন অবশ্য লিখেছেন ঃ a man's) অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেই তার কাজকর্ম ও ভাবনাচিন্তার একমাত্র অবলম্বন ভাবে।"

শিল্পসাহিত্যের সমালোচনা মনোবিজ্ঞানও নয়, ইতিহাসবিজ্ঞানও নয়, কিন্তু দুই সতীনের সঙ্গে তার হাত বাঁধা। একটি কবিতাকে বিশুদ্ধভাবে উপভোগ নিশ্চয়ই সব বিবেচনা সে সময়ে বাদ দিয়ে করা সম্ভব, সম্ভব কেন, প্রাথমিক পাঠে একমাত্র সংগত উপায়। কিন্তু একই কবিতা আবার অনেকভাবে ব্যাপ্ত পটভূমিতে পরিণতির অনেক স্তরে উপভোগ্য। কিন্তু সেই উপভোগকে চিনতে গেলে বুঝতে গেলে উপভোগে অবশ্যই সুবিধা হয় সেই কবির সব কবিতা, তাঁর সমসাময়িক কবিতা, সাহিত্য,—সেই ভাষার কাব্যধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে, তার জলমাটিশিকড় বিষয়ে, তাঁর মনের ও জীবনের আকাশবাতাস বিষয়ে চেতনা থাকলে।

সে দিক থেকে ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিক যুগসন্ধিতে রবীন্দ্রনাথই বিরাট বাণীমূর্তি স্বদেশ-আত্মার, যে স্বদেশ চৈতন্যের স্রোত-বিস্তারে শিল্পসাহিত্যের অন্বিষ্টের স্বপ্নপ্রয়াণে দ্রুতপরিবর্তনশীল; প্রাচীন জটিল সভ্যতাকে যে জীবনমৃত্যুতে রূপান্তরিত করছে আধুনিকতার ইতিহাসযন্ত্রণায়, হয়তো অনেকখানি গৌণ প্রতি-ফলনের অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে। কারণ ইতিহাসের স্বরূপনির্ণয় আজ সদসৎ বৃহত্তর অর্থে ইওরোপীয়ই, যদিচ সে ইওরোপকে ইতিহাসই দগ্ধ করে বিশ্বময় দিয়েছে আজ ছড়ায়ে।

তাই রবীন্দ্রনাথকে পরিগ্রহণের বিরাট চেষ্টায় আবার স্মরণীয় তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তার প্রতিভাদীপ্ত স্বরূপ এবং যুগযুগ-ধাবিত-যাত্রীর সংকট ও উত্তরণে বন্ধুর পন্থায় সৃষ্টিময় আত্মপ্রকাশ এবং স্মরণীয় তাঁর দুর্গত দেশের একালের বাস্তব সুখদুঃখের ভাবনা-চিন্তার অনিবার্য আপতিকতা ও গৌণতা। এ সত্যে মনোযোগী না থাকলে অর্থ হারিয়ে বসে দ্বিতীয় সত্যটিও; অর্থাৎ ঐতিহাসিক কারণে ইওরোপের প্রাথমিক ও মৌলিক নেতৃত্ব ও তজ্জনিত নানা ঐতিহাসিক কারণের ডায়ালেকটিক্‌সে আধুনিক বিশ্বের একত্ব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে যে পাউণ্ড বা এলিঅট সহজে স্থান পান না, সে বাছ-বিচারের অসহিষ্ণুতা যেমন ঐতিহাসিকত স্বাভাবিক, তেম্‌নি স্বাভাবিক তৎসত্ত্বেও তাঁদের মতো ইওরোপীয় কবিদের সঙ্গে আবার তাঁর, একটা ব্যাপ্ত অর্থে, যুগগত শতাব্দীগত তুলনীয়তা। আমাদের শিল্পসাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, আমাদের ইতিহাসের মানসে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে, বিস্তৃতভাবে আধুনিকতার আর্কেটাইপ, মৌলিক প্রতিনিধি; এমন কি দেশোত্তরভাবে উচ্ছ্রিত তাঁর আধুনিকতা, তাঁর সত্তাসংকটের সৃষ্টিমুখর ব্যাপ্ত আততির ক্লান্তিহীন গায়ত্রীতে। অধিকন্তু তাঁর শেষ বয়সের কাব্যগ্রন্থগুলিতে চিত্ররচনায় সচেতনতার রীতিতেই কালান্তর স্পষ্ট এবং সে বিচারের

নির্দেশে তিনি এলিঅটের, পিকাসোর প্রায় সহযাত্রী সমধর্মী অগ্রজ। কিন্তু অসাধারণ এই শেষ পর্ব বাদ দিলেও আধুনিকতার ইতিহাসে কেউ রবীন্দ্রকীর্তিকে বাদ দিতে পারেন না, উত্তরাধিকারকে রূপান্তরিত করতে, সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন মাত্র। সেই উত্তরাধিকারের ইমারতে মহল অনেক এবং নিছক কাব্যের একটি মাত্র মহলও প্রায় অন্তহীন। প্রসঙ্গত বলতে পারি, একবার এঁকালের বাংলা কবিতার এক সংকলনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রকাব্যসাগর আবার পারাপার করে দেখা গেল যে 'কবি-কাহিনী'র অংশ এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে পূর্বরঙ্গ কিছু উদাহরণ নিয়ে 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'শেষলেখা' অবধি অবলীলাক্রমে কোন্-না তিনশো পৃষ্ঠার আধুনিক একটি সংকলনগ্রন্থ হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু প্রকাশব্যবসায়ের রীতিনীতিতে তা সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে দ্বিতীয় দফার বাছাইতে যে সব কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা হল—এবং সে সংকলনে অদলবদল বা সংযোজন দুইই করা যেত, তার তালিকাও হল দীর্ঘ—প্রায় এলিঅটের সমস্ত কবিতাসংগ্রহের বর্তমান সংস্করণের সমান।

এলিঅটের কাব্য আলোচনায় আগে একবার দেখেছিলুম যে চৈতন্যের নগ্ন অর্থাৎ ভাবালু-সাজসজ্জাহীন কাব্যেই আধুনিকতার কাব্যরূপ সাক্ষাৎ শুদ্ধ হতে পারে, যেমন দেখা যায় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বের্টোলট ব্রেখটের কবিতায়। এবং সে বিবেচনায় 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখার' নবজাত রবীন্দ্রকাব্য 'ফোর কোআর্টেটস্'-এর চেয়ে একদিক থেকে শুদ্ধতর। অবশ্য এলিঅটের ঐ চতুরঙ্গ কবিতাটি খণ্ডিত মননের কবিত্বে, সত্তাসংকটের ও অবৈকল্যসংকটের বেদনার ঐশ্বর্যে, এক দীর্ঘ কবিপরিণতির অসামান্য কর্তৃত্বে বিষয়ের পঞ্চমুখ বিস্তারে পরম মূল্যবান আর তার নন্দনাবেদন বহু পাঠেও ম্লান হয় না। এবং রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যার

ও আরোগ্যোত্তর কবিতাগুলি এক মহাশিল্পীর নিজেরই দীর্ঘ কীর্তিকে, বৈদগ্ধ্যের নৈপুণ্যের সব অভ্যাসকে যেন কীর্তিনাশার বানে ভাসিয়ে দিয়ে আবার মুক্তিস্নাত দীনদরিদ্র সরলতায় পত্তন। ভাবতে ইচ্ছা করে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ অব্দের বাংলায় বাঁচলে, বা তারও পরে সাতচল্লিশে দেশবিভক্ত সরকারী স্বাধীনতার চেহারা দেখলে তিনি কাব্যকে কি রূপে প্রাণ দিতেন? অথবা এখন?

এ ভাবনাটা মোটেই আলস্যবিলাস নয়, বর্তমানের যন্ত্রণার তাগিদেই তার প্রয়োজন। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় পরিণতির ট্রাজিক মহিমায় যে মানবিকতার বিশুদ্ধ মূর্তি তা দুর্লভ ইওরোপের গতানুগতিক ঐতিহ্যবর্ধিত অথবা নব্য ঐতিহ্যবিরোধী রাগীমাত্র বা কমরাগী বা মিছামিছি রাগী কবির মধ্যে। এবং এলিঅট তো অনেক বেশি চান একটি ভূখণ্ডের জরিষ্ণু বিশেষ এক রাজনীতি, ধর্ম ও সাহিত্যতত্ত্বে নিজেকে নিরাপদ এক অ্যাংলোস্যাকসন অভিজ্ঞতায় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে। ভালেরিও তাঁর কবিতার মর্মর দেহে যতই নৈর্ব্যক্তিকতা খচিত করুন অথবা রিল্‌কে যতই কবিত্বশুদ্ধির সাধনাকে মননের অমানুষিকতায় নিয়ে যান—মালার্মেআন এঁরা কেউই আধুনিকতার আধিসংকটকে তার প্রকৃত অর্থাৎ ব্যক্তিসর্বস্বের অতীত পরিণতির প্রাণময় সচল তত্ত্বের আততিতে শেষ অবধি সংলগ্ন করেন নি। তাই শেষ অবধি তাঁদের মনে হতে পারে বৈজ্ঞানিক বা যথার্থ নৈর্ব্যক্তিক মননের অর্থাৎ বিশ্বের আধুনিকতার বিরোধী, প্রতীপরাজনৈতিক, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধর্মীয়তার সুযোগসুবিধায় বিশ্বাসী, জীবনে প্রত্যাবর্তনশীল—যদিও তাঁদের কবিমানসের তীব্রতা ও সেই জন্য তার মানবিক আবেদন, তার আকুতি কাব্যরূপের চূড়ায়িত আবেগে, তার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রয়োগদক্ষতায় দূর বিধর্মীকেও, পূর্বদেশীকেও নাড়া দেয়।

তবে ইওরোপেও—নাকি ইওরোপেই—দেখা গেছে সাবেক

আস্তিক্যের অবক্ষয়ে নেতির চরম উপলব্ধি কিভাবে কম বা বেশি শিল্পীর সাহিত্যিকের সত্তাকে সংগঠিত করতে পারে একালের ইতিহাসসংগত একাধারে তত্ত্বে ও সাহিত্যসৃষ্টিতে বিকাশ লাভ করার প্রক্রিয়ায়। এবং এই প্রক্রিয়ার বোধহয় শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন বের্টোলট ব্রেখট, তার শিল্প প্রতিভার তীক্ষ্ণতায় ও বিস্তারে আর তাঁর মননের শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও অপরাজেয় সততায় ও বিকাশের অনিবার্য মহত্ত্বে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আহত বোধ করেছিলেন এমি লোয়েল, রবিনসন, পাউণ্ড ও এলিঅটের অপেক্ষাকৃত শৌখিন, ইঙ্গ-মার্কিন সচ্ছল ও নিরাপত্তাশোভন যে বিতৃষ্ণাবিরক্তি-বিরোধিতার চালে, তা হয়তো আরো তীক্ষ্ণতা পেত ব্রেখটের প্রথম বয়সের তীব্রতর, নগ্নতর, প্রায় ভয়ংকর নাটক বা গান বা কবিতা পড়লে। শতাব্দীর বিশ দশকে লেখা শিকাগোর দৃশ্যপটে ভয়ানক নাটক 'শহরের জঙ্গলে' যখন পড়ি তখন মনে হয়েছিল যে সাহিত্য বুঝি আবার হিংস্র সমাজের শিক্ষক চিকিৎসক হচ্ছে, যেন আমরাই সাহিত্যিক শকথেরাপির প্রহার খেলুম, র‍্যাঁবো বোদলেয়রের আর আবার টলস্টয় বালজাকের উত্তরাধিকারের যোগ্য রীতিতে। এই রীতিরই দীর্ঘলয় গদ্যরূপ শেষ অবধি টমাস মানের বিচিত্র বিদগ্ধ সহিষ্ণুতার বাহন, মান্-ও তাঁর ফাউস্টুস অভিজ্ঞতা ও বোধির প্রশান্তি সীমাবদ্ধ রাখেন নি ভাইমার গণতন্ত্রের সান্ধ্য স্বপ্নে।

বের্টোলট ব্রেখটের জীবন ও রচনাবলী এবং তারই চিন্তাপ্রসূত তত্ত্বালোচনা সব মিলিয়ে মনে হয় যে, এই বুঝি, যতদূর সম্ভব, একজনের রচনার মধ্যে আধুনিক বিশ্বের শিল্পীসাহিত্যিক ব্যক্তিসত্তার সংকটক্রান্তির চূড়ান্ত রূপ। ক্রমশই দেশে দেশে বোঝা যাচ্ছে তাঁর রচয়িতৃশক্তির ক্রমাগত কৃতিত্ব এবং সংগত পরিণতির স্বরূপ। যখন প্রথমে প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এডউইন মিউর

নামক প্রিয় স্কচ্ লেখকের অনুবাদে ওআরেন হেস্টিংস বিষয়ে নাটকটি পড়ি তখন, স্বীকার করব, ব্রেখটের বিষয়ে আগ্রহের অপেক্ষা ঔৎসুক্য ছিল নাটকটির বিষয়টিতে এবং মূল লেখক লিওন ফয়খট-বাঙ্গেরের প্রতিষ্ঠা তখন ব্রেখটের চেয়ে আমাদের কাছে ছিল বেশি। মহাযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় পৌঁছল তাঁর কিছু লেখা, বিশেষ করে নাটক ও কবিতা এবং মনে হল বিংশ শতাব্দীর জীবন ও চিন্তার জ্যাবদ্ধ সম্পূরণ, এ যুগের আততির আধুনিক মনের বুঝি সাহিত্যে আভাস মিলল।

আধুনিক মননে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিচারমানই সর্বগ্রাহ্য বিশ্বজনীন সত্য। এবং একমাত্র বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিই সর্বত্র প্রযোজ্য, অন্তত তার ন্যায্য সম্ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টি, নিশ্চয়ই তা এক হিসাবে চিরকালের, অর্থাৎ মানবিক। কিন্তু একালেই এই দৃষ্টির নিরাসক্তির প্রকৃতি হয়েছে স্বচ্ছ, এবং নিরাসক্তি হয়েছে স্বয়ংসিদ্ধ, স্বাধীন অর্থাৎ শুদ্ধ, এবং সক্রিয়। কোনো ধনতান্ত্রিক সামন্তবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োগধর্মী অথবা অপর পক্ষে কোনো মরমিয়া, তাও-বাদী বা যোগমগ্ন বা তান্ত্রিক ধ্যানধারণায় নিঃশেষ নয়। এবং এই দৃষ্টি আর শুধু অনুমাননির্ভর বা অবরোহী নয়; আরোহী, যুক্তিনির্ভর কর্তৃত্ব এর দর্শনকার্যে; এবং তাই এর কর্মক্ষেত্র সর্বব্যাপী। কর্কশকে বীভৎসকেও এ দৃষ্টির নিরাসক্তি বর্জন করে না, কারণ যা চোখের সামনে তা দেখারই বিষয়, জীবনেরই অঙ্গ। ডাক্তারের দেখার মতো এর মধ্যে যেটা নিরাসক্তি বলে মনে হয়, সেটা ডাক্তারির নিজস্ব শুদ্ধ আসক্তি; অপর পক্ষে যেটা আপাতনির্মম নৈর্ব্যক্তিক মনে হয় সেটা আসলে মমতারই আরেক অর্থাৎ আরোগ্য চেষ্টার সক্রিয় নৈর্ব্যক্তিকতা। এই নিরা-সক্তির দৃষ্টি ও বিজ্ঞানীর মমতার প্রসঙ্গে ধরা যাক হলডেনদের মতো জীববিজ্ঞানীদের, হলডেনরা যখন মাছ নিয়ে জীববিদ্যার নিরাসক্ত

জ্ঞানবৃদ্ধিতে মগ্ন থাকতেন, তখন তাঁদের নির্মম বিদ্যাচর্চাতেও নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু গভীর মমতা। তা না হলে আর প্রতিষ্ঠানের লোক মাছেদের খাবার সরবরাহ করে নি বলে প্রতিবাদে অধ্যাপক হলডেনরা অনাহার ধর্মঘট করে থাকেন! অধ্যাপক ইয়ং ও তাঁর মেরুদণ্ডহীন জন্তুর জ্ঞানচর্চায় জিয়ানো অক্টোপাসদের প্রতি প্রায় ব্যক্তিগত মমতার গল্পও এই রকম মনোজ্ঞ।

আধুনিক কবিদের রচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন স্বভাবতই দেখেন ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা, অঘোরপন্থী বীভৎস বা কুৎসিতের প্রতি আকর্ষণ, তখন মনে রাখা উচিত, এই দুই মানসজগতের মধ্যে ব্যবধানটা কতখানি। কারণ ব্যাপারটা রাবীন্দ্রিকভাবে 'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা' মাত্র নয়। বস্তুত, প্রায় অত্যুক্তির পর্যায়ে পৌঁছলেও বলা যায় যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেও বিজ্ঞানীর এক রকম ব্যক্তিগত আসক্তি আছে, যদিচ সে সংলগ্নতায় হঠকারী ওথেলো ডেসডিমনাকে খুন করে বসে না। বিজ্ঞানের তদ্‌গতভাবে দেখার মধ্যে সম্ভাবনা নিহিত থাকে ঐ দেখার বস্তুকে জ্ঞানের প্রয়োজনসাধনের আয়ত্তে আনার, মানবিক কর্তৃত্বের, পরিবর্তনের।

তাই বোধ হয় ডাক্তার কার্লস উইলিআমসের মতো কবি লেখেন: The true value is that peculiarity which gives an object a character by itself. The associational or sentimental value is the false...তাই উইলিআমস্ বলেন: Here I clash with Wallace Stevens—এবং শেষ অবধি এলিঅটের সঙ্গেও। আর এ সংঘর্ষে বোধহয় বিচারক রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের আশীর্বাদ পেতেন এলিঅট, স্টীভনস্, রিল্‌কে, পাস্টের-নাকেরাই,—যদিচ রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা আহত বোধ করত এঁদের অসংলগ্ন শিষ্টতার চেহারায়। অবশ্য কার্লস উইলিআমস্‌ও

হয়তো নিজের দৃষ্টির চূড়ান্ত নৈয়ায়িক নিষ্পত্তিতে পৌঁছতে চান না, কারণ সে নিষ্পত্তিতে উঁকি দেয় প্যাটরসনকে উড়িয়ে দেওয়া এক সমালোচনা, সাবেক স্বত্বকে ভাসিয়ে দেওয়া এক রূপান্তরের আভাস। তাই তাঁর ইস্তাহার অসম্পূর্ণ থেকে যায় : There is nothing sacred about literature, it is damned from one end to the other, there is nothing in literature but change and change is mockery...কিন্তু শুধুই কি তাই? তাহলে তো স্টীভনসের সেই একদিকে টেকনিশ্যনস্ ও বিউরোক্র্যাটস্ আর অন্য দিকে শিল্পীরা, কবিরা চিরকাল সৌন্দর্যভোগী বিচ্ছিন্নতার পাঁচিলে চেপে বসে রইলেন। তাহলে কেনই বা ডক্ বলেন ঃ One does not seek beauty. All that an artist can do is to drive towards his purpose, in the nature of his materials! যেন এই বিষয়ের, এই বস্তুর মধ্যে উইলিআমস একতরফা দৃষ্টিতে দেখছেন জড়পদার্থমাত্র, অথচ এই শিল্পী আর শিল্পবস্তুর সম্বন্ধটা তো উভয়ত জঙ্গম, উভয়ত প্রভাবপরিবর্তনময়।

ব্রেখটের রচনায় প্রায় প্রথম দিক থেকেই এই সম্বন্ধ স্বীকৃত এবং তাই তারপরে সমানে তাঁর শিল্পীর কর্তৃত্বের বিস্তার ও বাহার, বলতে যাচ্ছিলুম প্রায় অসাধারণ কর্তৃত্বের অক্লান্ত প্রদর্শনী। ব্রেখটের জন্মভূমি যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হত, তাহলে হয়তো নয়া দেশের নর্ডিক নাগরিক সৌভাগ্যের মিশ্রতায় তাঁর বিকাশ সীমিত হত মার্কিন কাব্যের মার্কিন নাট্যসাহিত্যের চমকপ্রদ বাহাদুরিতে, আনকোরা জীবন্ত উদ্‌ভ্রান্ত মনের তারুণ্যে। কারণ মার্কিন জাতীয় মানস এই সবেমাত্র সত্তা সংগঠিত করতে যাচ্ছে, মার্কিন জাতীয় আইডেনটিটির ঐতিহ্য সবেমাত্র নির্মীয়মান। আর ব্রেখট জন্মেছিলেন জর্মানিতে যেখানে জাতীয় জীবন এবং সংবেদনশীল মন দীর্ঘকাল ধরে হারজিতের মধ্যে দিয়ে চলেছে লৌহনিয়ন্ত্রণে আর তার

উদ্দাম প্রতিক্রিয়ায়, যেখানে বহুবিধ মননের কর্মময়তা অক্লান্ত, আর প্রতিভার পরম আত্মপ্রকাশ নানা শিল্পের মাধ্যমে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও উল্লাসের তীব্রতায়, অনেক সময়ে উন্মত্ততায়—ক্লাইশট্, হ্যেলডেরলিন, নীটশে,—যেন মানবজীবনের প্রাত্যহিকতাতেই প্রতিদিনই দেবদেবী-দের টিউটনিক গোধূলিঝঞ্ঝা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভেরসাই শান্তিচুক্তি, নাৎসি হিস্টিরিয়াপর্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—এই হল ব্রেখটের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং হল জর্মানিতেই, পশ্চিম ইওরোপের জোসেফ অথবা কনিষ্ঠ দেশে। জর্মান সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বনাগরিকতা বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মধ্যে প্রতিবাদে প্রতিরোধে বিস্ময়করভাবে তীব্র তির্যক।

এবং ইওরোপের রোমান্টিক-বিরোধী কবিরা শব্দমাহাত্ম্যের প্রতীকময় নবরোমান্সে মেতেছিলেন নানাদেশেই। ব্রেখট কবিতা-লেখার তত্ত্ব ও অভ্যাসের দিক থেকে ফরাসী-জর্মান এবং কিছুটা হয়তো রুস কাব্যশুদ্ধির নতুন ঐতিহ্য যে তরুণ বয়সেই পরিপাক করেছিলেন, তা বোঝা যায় ইঙ্গ-মার্কিন অনুবাদ পাঠেও। কিন্তু বারোক রোকোকো যুগ থেকে শুরু করে বোদলেয়র গোতিয়ের এই উত্তরাধিকারী, আপলিনেয়র, রিলকে, এলিঅট, কক্‌তো, লরকা, পাউণ্ডের সহযাত্রী কাব্যতাত্ত্বিক বিপ্লবে আরেক মানসকে রূপ দিলেন এক্সপ্রেশনিস্টদের জ্বরস্ফীত ভাষা অথবা স্টেফান্ গেওর্গের আভিজাত্যবাদী নারীবর্জিত দাদা-মার্কা পৌরুষচর্চা পিছনে ফেলে। এজরা পাউণ্ড নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতেন ত্রুবাদুর আবহাওয়ায়, কাভাল-কান্তির জগতে, চীন-জাপানের মিতবাক চিত্রল সাহিত্যে এবং মেজর ডগলাসের ডিসট্রিবিউটিসম আর মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট রাজ-নীতিতে। ব্রেখট তাঁর প্রেরণার শারীরিকতা অর্জন করলেন সাধারণ বিপর্যস্ত মানুষের স্থূল-সূক্ষ্ম-করুণ ভয়ংকর হাসিকান্নার জীবনে এবং তারই কথ্যভাষায়, শহরে-চল্‌তি কথায়, সুরে আর তাঁর নিজের

আরণ্যক জন্মস্থান দক্ষিণ জর্মানির দেশজ ভাষায়। এবং জর্মান জনসাধারণকে যিনি আগের রেনেসান্সে দিয়েছিলেন প্রাণময় গদ্যভাষা এবং গানের প্রবল কাব্যভাষা, সেই মার্টিন লুথরের আদি উৎসে।

ব্রেখটের বহু আলোচিত এপিক থিয়েটার-তত্ত্ব নাট্যরচনার প্রযোজনার ও অভিনয়ের এক পদ্ধতি, কারণ ব্রেখট একাধারে তিন দিকেই ওস্তাদ, যাতে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাট্যচরিত্রের সঙ্গে একাত্মতায় লুব্ধ না হয়ে বিচারণা সমালোচনার মনোবৃত্তিতে তাদের দেখান, উপস্থিত বা প্রদর্শিত করেন বৈজ্ঞানিকের মমতায় কিন্তু নিরাসক্তি বা অনুকরণবৃত্তির নিষ্কামতায়, যাতে নিজেদের ও দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সক্রিয় রাখতে পারে। এপিক বা মহাকাব্যিক নাট্যশালা ব্রেখটের মতে অঙ্গুলিনির্দেশ করে—ৎসাইগেন, zeigen, এবং এপিক বলতে গয়টে শিলারের মতোই ব্রেখট সাবেক আরিস্টটেলীয় ব্যাখ্যাই নিয়েছিলেন, অর্থাৎ ট্রাজেডির তথাকথিত আপ্লুত আবেগ নয়, কাহিনীর নৈর্ব্যক্তিক নির্দেশকারী নাটকীয় সাহিত্য। আমাদের যাত্রার পিছনে এইরকম একটা দৃষ্টি কাজ করত, পালার দর্শক-শ্রোতা এবং অধিকারী ও অভিনেতারা সবাই জানত যে ব্যাপারটা যাকে বলে কাল্পনিক, শিল্পরচনায় বিনোদন—এন্টার্টেনমেণ্ট। কি লক্ষ্মণ কি শূর্পণখা কারো সঙ্গেই রিয়ালিষ্টিক একাত্মতা বা আত্মীয়তা নেই, এমন কি সীতা যদি আসরে ওঠবার সময়ে একটান ধোঁয়া ছেড়ে আসে, তাতেও কল্পনা ব্যাহত হয় না। তবে যাত্রার বিষয়জগৎ ছিল শুধু পুরানো কাব্যের নয়, অতিপরিচিত, ধর্মীয়ভাবে সবার মনের সঙ্গে জড়িত। তাই বিচারণা বা বৈজ্ঞানিক সমালোচক মনোবৃত্তি জাগানো সাবেকী যাত্রার বা পালাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং একালে কিছু কবিগান তরজা প্রভৃতিতে স্থূলভাবে হলেও এবং সূক্ষ্মসুকুমারভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে মূলত ব্রেখটীয় কালান্তর দেখা গেছে। ব্রেখট

নতুন বিষয়কে পরিচিত করে তোলেন ভূমিকায়, কোরাসে, গানে, দৃশ্যমঞ্চে নানাবিধ ব্যাখ্যার ইঙ্গিতে।

ব্রেখটের ভেরফ্রেমডুং বা বিযোজন বা বিযঙ্গীকরণের পদ্ধতি এই কারণেই উদ্ভুত। নানারকম অভিনয়কৌশলে, মঞ্চের উপরে নানারকম মঞ্চমায়াভঙ্গের কায়দায়, গানে, বাজনায়, নানারকম দৃশ্যপট ব্যবহারে নাট্যকাহিনীকে ব্রেখট করে তুলতেন বিনোদন ও সমালোচনের যোগ্য অনাত্ম ব্যাপার, অথচ মানবিকতার ব্যাপ্ত একাত্মতায় কি কাহিনীনাট্য কি অভিনয়প্রযোজনা ব্রেখটীয় থিয়েটারে হয় মর্মভেদী। সেই জন্যই পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রেখট দেশ ও কালের দিক থেকে উত্তরোত্তর দূরত্ব সন্ধান করে বেড়াতেন তাঁর কাহিনী বা বিষয় পরিগ্রহণে। তাতে দর্শক-পাঠকের সুবিধা থিয়েটারকে থিয়েটার মাত্র হিসাবে নেওয়ার। সেইজন্যই অরিজিন্যালিটি বা স্বকীয়তার সাবেকী বিত্তবান সন্ধান ব্রেখট বারবার সজ্ঞানে বিসর্জন দেন পুরানো গল্পের নাটকের পুনঃপ্রয়োগে, রূপান্তরে—যেমন দিতেন শেকসপিঅর, যদিচ তাঁর সামাজিক যুগের প্রয়োজন ছিল ঈষৎ ভিন্ন। বস্তুত যে অরিজিন্যালিটি স্বত্বাধিকারপ্রবণ পণ্যসভ্যতার ফলে ব্যক্তিসর্বস্বতারই শিল্পগত নাম, তার বিরুদ্ধে খণ্ডিত হলেও প্রতিবাদ জানান উদ্ধৃতিপ্রযুক্ত কাব্য-রীতিতে এলিঅট, পাউণ্ডের মতো সাবেক পশ্চিমা সভ্যতার সাহিত্যিকেরাও। তাই টমাস মান্ লেখেন প্রাচীন জোসেফের মহাকাহিনী, পুণ্যবান পাপীর নিদারুণ গল্প, ফাসিস্ট জর্মানির উপন্যাস লেখেন ডক্টর ফাউস্ট্‌সের সর্বপরিচিত তুর্ধর্ষ রূপকে। তাই আরাগঁর মতো সাম্যবাদীর কবিতায় ত্রুবাতুরদের মানসসুন্দরী এলেয়ানোর দাকিতেন হয়ে ওঠেন ফ্রান্সের প্রতিমা।

পাউণ্ডের 'ক্যাণ্টোস্' অথবা অনেকাংশে এলিঅটের 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এ ভিন্নভাবে পূর্বোক্ত পদ্ধতির আভাস, যার ফলে গতানুগতিক

অভ্যন্তরের পথ থেকে মনন বারবার ধাক্কা খায় দেশ থেকে দেশা-
ন্তরে একাল থেকে সেকালে, নব নব দৃশ্যে শ্রাব্যে নতুন সংযোজনায়
হয় তার চারিত্র্য সজাগ। তাতে ঘটনাপ্রবাহ হয়তো কাহিনীভাগে
লাফিয়ে চলে, শিল্পরূপের চেহারা মনে হয় শিথিল, আকস্মিক; কিন্তু
কবিতার উদ্দেশ্য লক্ষ্যসিদ্ধির পথে এগোয়। দর্শকের সঙ্গে নাট্যের
সবজেক্‌টিভ বা স্বয়ম্ভুর ইন্দ্রজাল বিস্তার না করেই হয় যোগাযোগ,
যেমন হতে পারে দুজন সমভাবে পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তির মধ্যে কথা-
বার্তায়, অনেক কিছু উহ্য রেখেও বা আবেগের প্লাবন না বইয়েও।
প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সোফোক্লিসের ঈডিপস্ নাটকের এক অভি-
নয়ালোচনায়, তরুণ ব্রেখটের ভালো লেগেছিল আবেগবন্যার মধ্যে
একটি গৌণচরিত্রে, জোকাস্টার অনুচরীর রূপায়ণে এক তরুণী
অভিনেত্রীর আবেগস্তম্ভিত হিম অভিনয়। (পরে এই অভিনেত্রীই
ব্রেখটের নাট্যসম্প্রদায়ে সবচেয়ে নামকরা অভিনেত্রী ও সহকর্মী
হয়ে ওঠেন, হেলেনে হ্বাইগেল, এবং ব্রেখটের সহধর্মিণী!)
শুনেছিলুম, রবীন্দ্রনাথকে যখন 'সীতা' দেখিয়ে নাট্যাচার্য ভাদুড়ী
মশায় জিজ্ঞাসা করেন কেমন লাগল, তখন কিঞ্চিৎ হতচকিত করে
রবীন্দ্রনাথ নাম করেন একটি গৌণ চরিত্রের অভিনয়, তুঙ্গভদ্রার।

অবশ্যই ব্রেখটের নাট্যনৈপুণ্য ভুঁইফোড় কিছু নয়। তাই
পিস্‌কাটরের এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট অপিচ বামপন্থী বিপ্লবীপনার দৃষ্টান্ত
থেকে ব্রেখট যথোচিত শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর সমজিজ্ঞাসু শিল্পী
ছিলেন নানা দেশে নানা মতবাদে, যেমন সোভিয়েট মায়াকফস্কি,
মায়ারহোলড, আইসেনস্টাইন, আবার তেমনি চার্লি চ্যাপলিন বা
মারিনেত্তি, পিরানদেল্লো, পণ্ডিত নেহরুর এক সময়ের সহকর্মী
ব্রেখটের বন্ধুস্থানীয় এর্নশট্ টলের ইত্যাদি। কিন্তু ওই বৈজ্ঞানিক
অনাত্মতা, ওই নৈর্ব্যক্তিক মমতা নাটকে কাব্যে মুখোমুখি হয় যে
বিষয়ের সঙ্গে, সে তো মানুষ এবং মানুষের জীবন বুঝতে গেলে,

ব্রেখট দেখলেন, জানতে হয় একালের অর্থনীতির রহস্য, ব্রেখটের মনে হল যে জানতে হবে সমাজের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতির বিজ্ঞান। এবং ব্রেখটের হ্বিসেস্‌নশাফট wissenschaft কথাটা ইংরেজি সায়েন্স-এর চেয়ে ব্যাপ্ত এবং তিনি ঐ আখ্যায় তথাকথিত বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের সঙ্গে মার্কসের ইতিহাসবিজ্ঞানও বুঝতেন। তাই তাঁর বিশ্বমানবিক বৈদগ্ধ্যের পরিক্রমা সারা দুনিয়া ব্যেপে : ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, রোমে, জর্জিয়ায়, চীনে, ভারতবর্ষে—স্বাধীন কল্পনায় কিপলিং-মার্কা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এবং অবশ্য জর্মানিতে, তিরিশ বছরের যুদ্ধের মড়ক ও মন্বন্তরে পীড়িত প্রাচীন এবং সাম্প্রতিক নাৎসিজর্জর জর্মানিতে।

বিশ্বপরিক্রমার নাট্যগত সার্থকতা হচ্ছে দর্শক-শ্রোতা এবং পাঠককেও এই দূরত্বস্থাপনের দ্বারা ভাবালুতার বা নিছক নির্মনন আবেগের ব্যক্তিক মার্গে আত্মদান করতে না দিয়ে আত্মসচেতন, মননির্ভর, সমালোচক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শিল্পসাহিত্যের সাবালক উপভোগ। ব্রেখটের বিষয়ে বিস্তৃত কিছু লেখা আমার সাধ্যাতীত এবং এখানে অবান্তরও বটে। তাছাড়া এই ক্লান্তিহীন সৃষ্টিময় সাহিত্যিক ও নাট্যকর্তার বিভিন্ন মাধ্যমে রচনা প্রায় অন্তহীন হলেও এরকম উভয় জর্মানিতে এবং বহুভাষায় বহুরকম অনুবাদ আর আলোচনা বোধহয় সাম্প্রতিক কোনো লেখকের ভাগ্যে ঘটে নি। এবং সবাই জানেন যে থিয়েটারের জগতে ব্রেখটীয় থিয়েটারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবও গভীর, যদিও ইঙ্গমার্কিন সমালোচকেরাই বলেন যে এই দলের প্রযোজনা আর সমবেত ও প্রত্যেকের অভিনয়ের কোনো তুলনা নেই। আমরা এখানে থিয়েটারের ভাগ্যে বঞ্চিত হলেও ব্রেখটের মঞ্চনাটকের যথাযথ ফিল্‌মসংস্করণ দেখেই মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারি এই নাট্যরীতির চেহারাটা। আর "মাতা সাহসিকা"-র প্রধান অভিনেত্রী

হেলেনে হ্বাইগলের জন্য লেখা ব্রেখটের কবিতাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের সেই সুপরিচিত কীটসের মতো ব্রেখটও নিয়ে যান কল্পনার পুষ্পকবেগে দূর দেশে দূর কালে বিপদসংকুল সমুদ্রের পারে কিন্তু শেষটায় তাঁকে হাহাকার করতে হয় না : forlorn ! the very word is like a bell that tolls me back ! ব্রেখটের জগতে আরিস্টটেলীয় ইপস্-নিয়ম অনুসারে সময় অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন নয়, যেমন নয় আধুনিক শিল্প ফিলমের টেকনিকে। ব্রেখট ভেবে দেখেছিলেন যে দর্শক-শ্রোতা-পাঠকেরা যদি কর্কশ বাস্তব থেকে আত্মরতির কল্পনাবিলাসের জগতে সান্ত্বনা খুঁজতে বা স্বকামতৃপ্তির ঘুমপাড়ানি আরামে পালাতে না চান অথবা লেখকেরা প্রযোজকেরা অভিনেতারা যদি তাঁদের পালাতে দেবেন না বলে সতর্ক থাকেন, তাহলে অতীত ও বর্তমান, দূর ও নিকটের ব্যবধান শিল্পের সত্যে আর পীড়াদায়ক থাকে না, বরং হয়ে ওঠে মননসমর্থ বিনোদন, অসংলগ্ন হৃদয়বৃত্তির অহিফেনস্বপ্নের পরিবর্তে। এই বিন্যাসের বৈচিত্র্যেই সার্থক হয় তিক্ততা ও মৈত্রী, ব্যঙ্গ ও করুণা, সার্থক হয় সমব্যথী সমালোচকের দৃষ্টিতেই পরিগ্রহণ। তাই তিনি চান ভাবমগ্নতা নয়, আত্মদান নয়, ভঙ্গীতে মুদ্রায় ধ্বনিতে ন্যাসে নির্দেশ—গেসটুস্ gestus—প্রায় যেরকম শিল্পগত ঝোঁক পাওয়া যায় জাপানী নো নাটকের চর্চায়, যেরকম প্রথাসিদ্ধ অভিনয়ে চীনের বিখ্যাত নট মেই লান ফাং মুগ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এবং ব্রেখটকেও।

এই থেকেই পল্লবিত বাকি সব ব্রেখটীয় ব্যাখ্যা-তত্ত্ব, যেমন সেই বহুখ্যাত বিষঙ্গীকরণ বা দূরত্বসংস্থান এবং তার এফেক্ট বা ফলাফল। ব্রেখট নিজেই একটি লেখায় দু-একটি উদাহরণে কথাটা স্পষ্ট করেছিলেন : কেউ যদি নিজের মাতাকে অন্যের স্ত্রী সম্বন্ধের রূপে দেখতে চায় তবে তার প্রয়োজন হবে একটা ভি-এফেক্ট বা বিষঙ্গীকরণী নিদান : সেটা মিলতে পারে, যদি

তার একটি বি-পিতা জোটে। কিংবা যদি কেউ দেখে মাস্টার মশায়কে তাড়া করেছে বাড়িওয়ালার দারোয়ান বা আদালতের পাইক, তখন ছেলেটি যে সম্বন্ধপাতে মাস্টারমশায়কে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেবদানব ভাবত, সে সম্বন্ধবন্ধন থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে দেখে যে মাস্টার মশায় বেচারা নিতান্তই ছোটখাটো মানুষ।

আপনাদের স্মরণ করাই পূর্বপরিচিত সেই রিচার্ড কোরির কবিতা। যারা মুগ্ধ নেত্রে কোরিকে দেখত, তিনি কথা বললে বিগলিত হত, তারাই শুনল যে ক্রোড়পতি রিচার্ড কোরির মতো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মাথায় গুলি চালিয়ে দেহরক্ষা করেছেন আর এদিকে তারা রুটিকে গাল পেড়ে পেট ভরাচ্ছে, কারণ মাংস তাদের জোটে না। সন্দেহ নেই এই বিষঙ্গীকরণের মধ্যে প্রায় একটা ব্যঙ্গের আমেজ এসে যায় মনে হতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথের মানবিক সমানুভূতি ও তাত্ত্বিক অভ্যাস তাতে আহত বোধ করত। তাই পাউণ্ডের, এলিঅটের বা এমি লোয়েলের কবিতা তিনি ভুল বুঝেছিলেন। ব্রেখট তথাকথিত এম্প্যাথির একটা সংগত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন : একটা উদাহরণ ধরুন : ভাই যুদ্ধে যাচ্ছে, বোন তাই কাঁদছে ; যুদ্ধটা হল জর্মানিতে চাষিযুদ্ধ, যে চাষীরা মার্টিন লুথারকে সমর্থন করেছিল, ভেবেছিল যে ধর্মীয় পুনর্সংগঠন তাদের জীবনেরও রিফর্মেশন, কিন্তু কৃষকদের অভ্যুত্থানে লুথারের সন্ত্রস্ত সমর্থন গেল রাজারাজড়াদের পক্ষে (ইতিহাস-বিখ্যাত এই নৃশংস ব্যাপারটা জন অসবর্নের লুথার বিষয়ে এরিকসনীয় নাটকে একটি আশ্চর্য দৃশ্যাঙ্ক)। ঐ ছেলেটি চাষী, সে যাচ্ছে চাষীদের সঙ্গে মিলতে, লড়তে। এখন আমরা কি করব, মেয়েটির দুঃখে আত্মহারা হব ? নাকি একেবারেই বিচলিত হব না ? কোনো একটাই নয়, মেয়েটির কান্নার আবেদনে মগ্ন

হতেও আমরা চাই আর সঙ্গে সঙ্গে মগ্ন না হবার ক্ষমতাও চাই। আমাদের প্রকৃত শিল্পঘটিত আবেগ আসবে ঐ দ্বৈতপ্রক্রিয়াটি একই যোগে চিনতে পারায়, অনুভব করায়। ব্রেখটের পরিণত নাটকে কাব্যে মানুষের বিষঙ্গীকৃত সুখদুঃখই রীতিতে ও বিষয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে।

তত্ত্ব ও ক্রিয়াকর্মের সার্থক মিলনে বোধহয় ব্রেখটেরই মধ্যে হালকাগভীর, ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ অনুকম্পাকরুণ কবিতা গান নাটক উপন্যাস নাট্যপরিচালনা ও তত্ত্বালোচনা সবচেয়ে পরিণত। কিন্তু এই আপাতজটিল মননের বিন্যাসেই অনেকের বাধাগ্রস্ত লাগে, যদিচ জীবনই বহুগ্রন্থিতে জটিল এবং শিল্পসাহিত্যের তিন হাজার বছরও কম জটিল নয়। ১৯২৬ থেকে ব্রেখটের স্পষ্ট উপলব্ধি হল যে বৈজ্ঞানিক যুগের আধুনিক শ্রোতাদের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলি বিন্যস্ত করায় সুবোধ্য করায় সাহায্য করে দ্বান্দ্বিকন্যায়তত্ত্ববাদী বাস্তবের তত্ত্ব। তিনি বলেন : যখন আমি মার্কসের 'ডাস কাপিটাল' পড়লুম,তখন আমি বুঝতে পারলুম আমার সব নাটক। স্বভাবতই আমি চাই এই পুস্তকটির বহুল প্রচার। অবশ্যই এটা ভাবলে ভুল হবে যে আমি যেন অজ্ঞাতসারে এক গাদা মার্ক্সিস্ট্ নাটক লিখে ফেলেছিলুম, কিন্তু এই মার্কস্ ভদ্রলোকটিই আমার সব নাটকের একমাত্র দর্শক বলে মনে হল। কারণ যে লোকের ভাবনাচিন্তা তাঁর মতন, সেরকম মানুষের বাধ্যতই পছন্দ হবে আমার নাট্যরচনা, আমার লেখার অত বুদ্ধির ধার বলে নয়, বুদ্ধির ধার তাঁরই বলে—ওগুলো কেবলমাত্র তাঁর ভাববার মতো একটা জিনিস বলে।

কারণ মার্কসীয় দর্শন সাহায্য করে মানুষের সম্বন্ধসমূহ বুঝতে, মানুষের আচারব্যবহার চোখ খুলে দেখতে, মানুষের শক্তির নির্দিষ্টতা ও তার অপরিসীম সম্ভাবনাময়তার স্বরূপ চিনতে জানতে। তাই

পরিণত বয়সে ব্রেখট আর এপিক থিয়েটার আখ্যা না ব্যবহার করে বলতেন ডায়ালেকটিকল থিয়েটার অর্থাৎ যে থিয়েটারের তত্ত্বের ভিত্তি দ্বন্দ্বোত্তরকন্যায়ে এবং মঞ্চে ও নাটকে ঘটনা সংস্থাপনকে বলতেন ঘটনাকে দ্বান্দ্বিক নৈয়ায়িকতায় রূপায়ণ এবং এ সবের মূলে আছে মানুষের পরিবর্তনের বা রূপান্তরণের প্রেরণা, প্রচ্ছন্নে বা প্রকাশ্যে, অনুভবে বা সজ্ঞানে।

এবং মজাটা হচ্ছে ব্রেখটের অগণিত ভক্তদের মধ্যেও এই ডায়লেকটিক্সের লীলা, তা সে কি লৌহযবনিকার এ পারে বা স্বর্ণযবনিকার ওপারে। ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসী বা পশ্চিম জর্মান রসিক-সমাজে তাঁর সমঝদার অনেকে পারবেন না তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে তাঁর কম্যুনিজমটা হজম করতে, ব্রেখটের কবিতার ভাষায় যার চেয়ে নাকি সহজ স্বাভাবিক আর কিছু নেই!—কিন্তু তাঁরাই তাঁর বিস্ময়কর শিল্পসিদ্ধির কাছে পঞ্চমুখ নতমস্তক, কারণ আধুনিক সাহিত্যের দক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্রেখটেই পেয়েছে অভূতপূর্ব সার্থকতা—গণ্ডার্খ্যাত ইওনেস্কো ব্রেখটকে বয়স্কাউট বলে সান্ত্বনা পেলেও। এবং তাই কখনও বাঁ কখনও ডান এক চোখ টিপে এঁরা ভাবতে চান যে ব্রেখটের মার্কসিজম একটা খেয়াল, একটা শখ। আবার সাম্যবাদীদের মধ্যে অনেকে মহাখুশি—যেমন ট্রেটিয়াকফ বা ফ্রাড্‌কিন—যে কাব্যের নাটকের এক মহান শিল্পী তাঁদের পক্ষে, যদিচ আবার অনেকে বিমূঢ় তাঁর শিল্প-চর্চার স্বাধীন মনীষায়। ব্রেখটের নিজের নিশ্চয়ই এই মতমতান্তরের ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় মজা লাগত—I have never found anybody without a sense of humour who could understand dialectics. বিতর্কভিত্তিক মতবাদের বলেই ব্রেখট উলব্রিখট সরকারকে, অনেকের মতে প্রায় গায়ে পড়ে সমর্থন জানাতেন, আবার অনেকের মতে দুঃসাহসীভাবে সমালোচনাও করতেন।

তাই, তিনি স্টালিনকে দেশের মুক্তিদানের নেতা বলে পৃথিবীর হতভাগ্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী মুক্তিকামী নেতা বলে কবিতা লেখেন। সেই জন্যই আমেরিকা প্রবাসকালে কম্যুনিস্ট-দমন সমিতির জেরার সামনে তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি সততার সওয়ালজবাব দুরন্ত নাটকের মতো আনন্দদায়ক, মনে হয় তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতি ভাষার কর্তৃত্বে তিনি অস্কার ওয়াইলডের সওয়ালজবাবকেও হারিয়ে দেন। এখানেই তো তিনি বলেন: হ্যাঁ, অবশ্যই আমাকে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল বৈকি মার্কসের ইতিহাস সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা। আমার তো মনে হয় আজকাল বুদ্ধিমান নাটক লেখাই যাবে না, ঐরকম পঠনপাঠন ছাড়া।

প্রসঙ্গত, লক্ষ্য করা ভালো ব্রেখটের হিউমারে এরিকসনের একটি মন্তব্যের অসতর্কতা হাস্যকর লাগত নিশ্চয়। মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাসতত্ত্ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে উভয়ত ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁর এ কথা সবাই মানবে; মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে হয়তো স্টালিনের শেষ বয়সের আত্মগরিমাস্ফীতি বা ক্রুশ্চফের নাটকীয় ভাঁড়ামি অথবা মাওৎসেতুঙের অসুস্থ আতিশয্যের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এরিকসন যখন বলে ফেলেন যে মার্কসবাদে—একটি বিশেষ ব্যক্তিরও—মানবগোষ্ঠীর বা শ্রেণীর নয়—অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিচারমানে প্রাধান্য দেয়, তখন মার্কসবাদের এরকম স্থূল যান্ত্রিকভাবে অপপ্রয়োগে ব্রেখট হেসে ছড়া কাটতে পারতেন—মনের অগোচর পাপ নেই!

মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ সংকটাবস্থা ব্রেখটের রচনায় আসে নানাভাবে পরিণতির ও প্রকাশের পর্যায়পরম্পরায়, যে ক্ষুরধার সংকটের পথে তাঁকে প্রায় সেই রবর্ট ফ্রস্টের কবিতার মতো স্থির করতে কোন পথ বেছে নিতে হবে অরণ্যের মধ্যে। কখনও বা সমস্যা নাটকীয় চরিত্র পায় চার বৈমানিকের উড়োজাহাজভাঙা অসহায় পরিস্থিতিতে, কিংবা ইস্কুলের ছেলেদের পার্বত্য অভিযানের

মধ্যে একটি রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে সমস্যা। কিংবা বিদেশে প্রেরিত রাজনৈতিক গুপ্তকর্মীর সমস্যা, একজন ভুল করেছে মারাত্মক রকম আর সে নিজেই তা বুঝে মৃত্যুর সমাধান চায় এবং তার সহকর্মীরা ভেবে চিন্তে শেষে তার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। অথবা স্পানিশ গৃহযুদ্ধের সময়ে সেঞোরা কারারের এইরকম পথনির্বাচনের সংকট। বস্তুত, এরকম সরাসরি না হলেও ব্রেখটের অধিকাংশ নাট্যরচনার উপজীব্য এই সংকটবোধের দ্বিধাযন্ত্রণাই। তাই তাঁর সদাজিজ্ঞাসুতায় এত আস্থা, লঘু বা তিক্ত হৃদয়বিদারক দ্ব্যর্থতায় এবং দ্ব্যর্থময়তার মিশ্র কারুণ্যে। তাই তাঁর গালিলেও, সেটজুয়ানের ভালো মানুষটি, ককেসীয় খড়ির বৃত্ত—এই তিনটি পূর্ণ পরিণত নাটকে নির্বাচনের সংকট অথবা ব্যক্তিদের বিষঙ্গভঙ্গিল মনের যন্ত্রণা ও নাটকীয় উত্ত-রণের মানবিক গৌরব পেয়েছে তাৎপর্যের অসাধারণ গভীরতা, কঠিন অনুকম্পা।

ব্রেখটীয় শিল্পসাহিত্যের উপভোগের মতোই প্রভাবও তাই নানাদেশে এত ব্যাপক, এবং আরো ব্যাপ্ত হলে মানুষেরই লাভ। ব্রেখটের তত্ত্বের ও রচনার উভবলিত্বে যাঁরা দুঃসময়ে আত্মরক্ষার চাতুর্য মাত্র দেখেন, তাঁরা মতবাদের সংস্কারবশত ভুলে যান যে পণ্ডিত নেহরুকে চতুর নিপুণ টাইটরোপডান্সর বলায় বা ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টকে তুখোড় মার্কিন কূটনীতিজ্ঞ বলে হাঁফ ছাড়ায় না বোঝার গ্লানিটা তাঁদেরই গায়ে পড়ে। মার্কসবাদীদের ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই শোচনীয় ভুলই, এবং মনোবিজ্ঞানীর সাহায্যে নিশ্চয়ই তার অনেকটা নিবারণ সম্ভব যেমন সম্ভব আরো ঐতিহাসিক অবহিতিতে। কিন্তু এটাও ঠিক যে ক্রুশ্চফদের ভুলভ্রান্তির উত্তরণ সম্ভাবনা নিহিত আছে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসসংলগ্নতায়, দ্বান্দ্বিকন্যায়ের বাস্তব-তত্ত্বের গতির বিধিব্যবস্থাতেই; তাই ম্যাকমিলানের হাসপাতাল

যাত্রা ও লর্ড হিউমের প্রধানমন্ত্রিত্বে উন্নতির সঙ্গে মার্কসবাদীদের ব্যবস্থান্তরের তুলনাই হয় না।

মার্কসীয় দর্শন ও সোভিয়েট ইউনিঅনের নেতৃত্বের ভয়ে যাঁরা সন্ত্রস্ত তাঁরাও কিন্তু চিন্তার পাকে, সৃষ্টিকার্যে তার ভেষজপ্রভাব এড়াতে পারেন নি। অধিকন্তু ব্রেখটের সাহিত্যিক নাট্যকর্মীয় শিল্পগত উৎকর্ষ এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে তার নন্দনময় ভেষজপ্রভাব পূবপশ্চিম এড়াতে পারে নি, ভুল বুঝে বা অর্ধেক মেনে অথবা কিছু না জেনেও। সেকালে যেমন ইংলণ্ডে মাকিয়াভেলির রাষ্ট্রচিন্তা এলিজাবিথান জ্যাকবিয়ান নাট্যকারেরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেও পরোক্ষে লাভবান হয়েছিলেন, তেমনি আনতোনিও গ্রাম্‌শি-কথিত নবযুগের এই রাজন্যের উত্তরাধিকার ইতি-ও-নেতিতে বিশ্বব্যাপ্ত জীবনে ও সাহিত্যে।

তাই ১৯৩৮-এ ভাবীকালের মানুষদের কাছে বর্ট ব্রেখটের এই বিষাদগম্ভীর সম্বোধন :

সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে।
অকপট কথা আজ অদ্ভুত শোনায়। আজ প্রসন্ন মুখের অর্থ
নির্মম হৃদয়। আজ যে হাসতে পারে
সে বুঝি বা শোনে নি এখনও
ভীষণ সব সংবাদ।

আমাদের এ কী যুগ!
যখন গাছপালার কথা বলা প্রায় একটা অপরাধ,
কারণ তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো একরকম নীরবতাই বটে।
আর আজ পথেঘাটে যে লোক চলতে পারে শান্ত, স্থির ভাবে,
সত্যই সে আছে তার দুঃস্থ অসহায়
বন্ধুদের নাগালের বাইরে।

কথাটা সত্য বটে যদি বলো ঃ আমি খেটে খাই,
কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা দৈবাৎ ঘটনা।
আমার জীবিকা যাই হোক্‌, তাতে আমার বাঁচার অধিকার বর্তায় না।
বেঁচে থাকাটাই একটা আকস্মিক ব্যাপার (কপাল যদি ভাঙে তবেই
গিয়েছি)।

ওরা বলে ঃ খাও-দাও। খুশি থাকো খেতে-দেতে পাচ্ছ।
কিন্তু কি করেই বা এমুখে খাই দাই
যখন আমার অন্ন ক্ষুধার্তের মুখ থেকে ছিনিয়ে জোগাড় করা
যখন আমার জলের গেলাসে তৃষিতের অধিকার!
তবু খাই-দাই।

আমিও তো প্রাজ্ঞব্যক্তি হতে চাই ;
প্রাচীন পুঁথিতে লিখেছে প্রজ্ঞা কি বস্তু ঃ
বিশ্বের যা কিছু দ্বন্দ্বময় তার থেকে দূরে থাকো, কাটাও তোমার আয়ুটুকু
কাউকে ভয় না করে,
হিংসাপ্রয়োগ বিনা,
যা সৎ ফিরিয়ে দাও অসৎ-কে হাতবদলে ;
আকাঙ্ক্ষার তুষ্টি নয়, বিস্মৃতিতে
প্রজ্ঞার সাধনা—
এর কিছুই আমার সাধ্য নয়!
সত্য বটে, আমি আছি অন্ধকার যুগে।

শহরে আমার আসা বিশৃঙ্খলার সময়ে
যখন ক্ষুধাই রাজা।

মানুষের মধ্যে আমার আসা যে গণ-উত্থানের লগ্নে
আর আমিও যে বিদ্রোহী।
তাই তো ফুরিয়ে গেল আমার সময়

মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

আমার খাওয়া সারতে হয়েছে হত্যাতাণ্ডবের ফাঁকে ফাঁকে,
আমার ঘুমের উপরে পড়েছে খুনখারাবির ছায়া,
আমার প্রেমের মধ্যে তাই তো এসেছে ঔদাসীন্য।
নিজের স্বভাবে আমি বোধ করেছি অধৈর্য।
তাই তো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

আমাদের কালে পথের শেষ হয় চোরাবালিতে।
আমার বাক্‌শক্তিই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে কসাইদের হাতে।
অল্প আমার ক্ষমতা। কিন্তু আমি না থাকলে
শাসকেরা আরেকটু নিশ্চিন্ত হত। এই অন্তত ছিল আমার আশা।
তাই তো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।

তোমরা যারা বেরিয়ে আসবে এ বন্যা থেকে
যাতে আমরা ডুবছি,
ভেবে দেখো,
যখন তোমরা আমাদের দোষত্রুটির হিসাব করবে, তখন
ভেবো এই অন্ধকার যুগের কথাও
যার জঠরের ব্যথায় এদের জন্ম।

কারণ আমরা দেশ পালটিয়েছি জুতার পাটির চেয়ে বেশি বার,
বাধ্য হয়ে, শ্রেণীসংগ্রামে, মরিয়া ব্যথায়,
যখন অন্যায় ছিল, ছিল না তার প্রতিরোধ।

কারণ আমরা ভালোই জেনেছিলুম
দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণায় ললাট হয়ে ওঠে
নির্মম কঠিন :
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে রাগ
তাতেই কণ্ঠ হয়ে ওঠে কর্কশ। হায় রে! আমরা

যারা প্রাণ দিতে গেছি দয়ামায়ার বনিয়াদ গড়বার জন্য,
আমরা নিজেরা দয়ামায়া রাখতে পারি নি।
তবুও, তোমরা, যেদিন শেষটায় সহজ হবে
মানুষের পক্ষে সব মানুষকে হাত এগিয়ে দেওয়া,
সেদিন তোমরা আমাদের বিচার কোরো না
খুব একটা কর্কশতায়॥

'কবিকাহিনী'র বাঙালী কবির সংকটবেদনা জর্মানির পীড়িত, দীর্ণ, হিংস্র জীবনের নগ্নতার মুখোমুখি হয়ে সম্পূর্ণ করল বিশ্বমানবিক ও সাহিত্যিক পরিণতির বৃত্ত। কখনও জটিল গভীর কখনও লঘু তিক্ততায় ব্যঙ্গে, কখনও ভয়ংকর তীব্রতায়, গম্ভীর কারুণ্যে, আশার অজেয় আস্তিক্যে, উদাস কবিত্বে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসু জর্মান কবি সৃষ্টিময় অস্থিরতায় প্রগতিশীল তত্ত্বের স্থিরবিন্দুতে অটল সর্ব শিল্পের সংলগ্নতার প্রয়োগে আধুনিক মননকে দিয়েছিলেন সত্তার জঙ্গম সমাধান, এবং সাহিত্যিক রূপায়ণ। কারণ রবীন্দ্রানুজ এই বিদেশী কবি নিজে তো অর্জন করেছিলেন বটেই সংগীতকারের, চিত্রকরের, ফিলম্-কারের, সাহিত্যিকের, নাট্যশালার বন্ধুত্ব সহকর্মিত্ব, তিনি নিজেও গায়ক ও গীতকার এবং আরো অনেক কিছুই ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো সংকুচিত বোধই করতেন ব্রেখটের যুবাবয়সের হালকা ব্যঙ্গে,—যদিও ষাট দশকে আমাদের কানে তাঁর কল্পিত ইংরেজি বানারসের গান কেমন যেন টূরিজম-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে চেনা-চেনা লাগে—ডম্ মোরেসের, বেদ্ মেহ্‌তার নিউইঅর্কের জগতের পরে এই বীটনিক-ভক্ত কলকাতায়—

শহরে হুইস্কি নেই ভাই রে
বসব যে বারে নেই ঠাঁই রে
হায় হায়!
কোথায় যে টেলিফোন!

এখানে নেইকো বুঝি টেলিফোন!
ও মশায়, ঈশ্বরই মারলেন শেষটায় :
না, না, আয় চলে আয়
চল্ যাই বানারস সকলে,
সূর্য সেখানে সদা উজ্জ্বল।

চল্ যাই বানারস সকলে,
ওরে জনি! চল্ তবে চলে যাই!

যদিচ প্রায় সেই বয়সেই ব্রেখট এমন কবিতাও লিখতেন, যা আমাদের রাবীন্দ্রিক নিসর্গপ্রেমকেও মুগ্ধ করে :

প্রেমিকেরা

দেখ বন্য বলাকার ঝাঁক ঐ উধাও বিরাট বৃত্তে।
মেঘমালা পিছে তারা ফেলে যায়, পেলব কোমল
সেই মেঘেরাই ভেসে ভেসে চলে তাদেরই পাখার ছন্দে
যখন উড্ডীন তারা পুরানো জীবন ফেলে অন্য এক খোঁজে।

ওরা দুই দল উড়ে চলে একই ঊর্ধ্বতায় আর একই বেগে,
মনে হয়, যেন কোনো উভয়ত প্রাসঙ্গিকতায়।

থাকে থাকে মেঘ আর বন্য পাখী এভাবে যে ওড়ে
মধুময় আকাশের মিলিত সম্ভোগে, ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্র অতিক্রমে!

কোনো দলে থম্‌কায় না কেউ কোনোখানে কোনো ফাঁকে,
কোনো দিকে তাকায় না ফিরে, শুধু পরস্পরে দেখে পরস্পর
আন্দোলিত কি ভাবে বাতাসে, প্রত্যেকেই বোঝে অনুভবে
বাতাসও তাদের গায়ে গায়ে চলে, যেমন তারাও সান্নিধ্যে উড্ডীন।

সুতরাং যতই না বাতাস তাদের শূন্যে ঠেলা দেয়,
তারা যদি কেউই না বদলায় কিংবা ছত্রভঙ্গ হয় নাকো,
ততক্ষণ তাদের অঙ্গ যে স্পর্শ করবে এত শক্তি কারো নেই,

ততক্ষণ তারা শুধু বিতাড়িত দুনিয়ার সব ঠাঁই থেকে
যেখানেই ঝড় কিম্বা গোলাগুলি তোলে প্রতিধ্বনি।
তাইতো সূর্যের আর চাঁদের অভিন্নপ্রায়, প্রায় একাকার
মুখের তলায় তারা উড়ে চলে পরস্পর মিলে পরস্পরে।
যায় কোথা?—কোথাও না। কার থেকে, কিঁ থেকে পালায়?
—তোমাদের সকলের ॥

বস্তুত নিসর্গপ্রকৃতির আরণ্যক হিম অপরাজিত ব্রেখটের সব উত্তাপজ্বালার তলে তলে। "বেচারা ব-ব-র বিষয়ে" তিনিই না লিখেছিলেন:

আমি বের্টোলট ব্রেখট এসেছি কৃষ্ণ অরণ্য থেকে বেরিয়ে।
আমার মা এলেন আমাকে নিয়ে ভিড়ের শহরে,
আর আমি রইলুম তাঁর দেহের অন্তরে। আর ঐ অরণ্যের হিম
মর্মে মর্মে থেকে যাবে আমার অন্তরে, যতদিন না মৃত্যু ঘাড় ধরে।

'থ্রীপেনি অপেরা' বা প্রত্যক্ষতায় অসাধারণ 'থ্রীপেনি নভেল' ভয়ংকর লাগলেও রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের, high seriousness-এর, সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্যের সমর্থনই করতেন!

লোকে বেঁচে থাকে কেমন করে? থাকে, কারণ তার সঙ্গী সাথীরা
নির্যাতিত, যন্ত্রণায় জর্জরিত, তাদের সর্বস্ব অপহৃত, কারণ তাদের গলায়
দড়ির ফাঁস, কারণ তারা মরে।

সমর্থন করতেন এই স্বচ্ছ সংশয়:

যদিও আমরা অনেক যত্নে ভেবেছি
সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতির বিষয়ে, ভেবেছি
মানুষের শরীর বিষয়ে, বিশ্বতত্ত্বের
বিষয়ে, ভেবেছি বায়ুর কি কি উপাদান
আর মহাসাগরের মাছের বিষয়ে,
করেছি অনেক বড় বড় আবিষ্কার।

আর তার উত্তরে কোরাস

তাতে কৈ রুটির দাম তো কমল না

বরঞ্চ

দারিদ্র্য বেড়ে গেল আমাদের শহরে শহরে !

কারণ ব্রেখট প্রশ্ন তোলেন সভ্যতার সংকটে কালান্তরের মানসিকতায় শিকাগোর 'সেন্ট জোনে'র মতো ঃ

তোমার অন্তিম লক্ষ্য যেন না হয়

যে মরণ-কালে

তোমার হবে সদ্‌গতি।

তোমার লক্ষ্য হোক

যেন তোমার মরণের প্রহরে

তুমি রেখে যাও আরো সদ্‌গত এক বিশ্ব।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-সাহিত্যিক মানবধর্ম বিচিত্র বহুরূপের জটিল বৃত্তের পূর্ণতা পেল এই কবিরই আধুনিকতায়। সংকট ও উত্তরণের তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার জঙ্গম আততির রূপান্তর ব্রেখটীয় শিল্পসাধনায় সজ্ঞান তত্ত্ব হিসাবেই স্বীকৃত শিল্প-সাহিত্যের নন্দনময়তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জীবন্তভাবে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	শুদ্ধ
১৭	৬	অনির্বাণদীপ্তি	অনির্বাণ দীপ্তি
১৭	১৭	যেমন	যেমন ধরা যাক্
৩৪	১৭	শিল্পকর্মকে	শিল্পকর্মের দায়িত্বকে
৩৮	১৩	অভিজ্ঞতার	ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতার
৫১	২৫	ছাড়িয়ে	ছাড়িয়ে খুলে
৭১	১৮	ধর্মবিরোধিতায়	শুধুমাত্র ধর্মবিরোধিতায়
৮৯	২৪	করতে	করতে হয়